অনীক

নভেম্বর ২০১১
বর্ষ ৪৮ q সংখ্যা ৫

সম্পাদকীয় q ১

ঘটনাপ্রবাহ

এই মৃত্যু-উপত্যকা... q মিতা দত্ত q ২

বিষও দেব, ওষুধও দেব— নোভার্টিস q শুভ্রকেতন বসু / মিতা দত্ত q ৩

সোনি সোরিদের গণতন্ত্র q পরিচয় কানুনগো q ৫

ভূ-রাজনীতির কয়েকটি ঘটনা q ফারুক চৌধুরি q ৮

প্রবন্ধ

মার্কিন মুলুকেও সদর দপ্তরে কামান দাগার তূর্যধ্বনি q দীপ্র চৌধুরী q ১০

আমরা ৯৯ শতাংশ q আনু মুহাম্মদ q ১৪

পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পি-পি-পি মডেল q সিদ্ধার্থ গুপ্ত q ১৬

গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের সংগঠক... q কাত্যায়নী q ২১

ভারতে অধিকার আন্দোলনের দিশা q দীপংকর চক্রবর্তী q ৩০

স্মরণ

স্মরণ : নূরুল হুদা মির্জা q ১৩

যোগাযোগ, লেখা, চিঠিপত্র ও
টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৮৭৭৫৬০
গ্রাহকদের যোগাযোগ : ৯৮৩০১৪৩৩৬৫/৯৪৩৩৭২৪৪৬২
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek64@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১১, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা ৭০০ ০০৯
(মঙ্গলবার : সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা)

সম্পাদকমণ্ডলী : **দীপংকর চক্রবর্তী রতন খাসনবিশ সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব**

নভেম্বরের ডাক

ক্যালেন্ডারে প্রথমে অক্টোবর ও তারপর নভেম্বরের পাতা এলেই দূর থেকে অসচেতনভাবেই যেন ভেসে আসে ৯১৭-র রাশিয়ার আর ১৯৪৯-এর চীনের কামানগর্জনের ধ্বনি, কিংবা এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার ব্যাপক মুক্তিযুদ্ধের কলধ্বনি— এবং বিগত সত্তরের দশকের সেই উদাত্ত গণসঙ্গীত : নভেম্বরের ডাক শোনো। কিন্তু পরবর্তী কয়েক দশকে দেশে দেশে বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই স্তিমিত হয়ে আসার প্রক্রিয়ার প্রেক্ষিতে পুঁজিবাদের চরম অশ্লীল আত্ম-বিজ্ঞাপন ও গর্বিত পদচারণা সেই স্মৃতিকে অনেকটাই ঝাপসা করে দিয়েছে ব্যাপক মানুষের মন থেকে।

এই হতাশার পটভূমিকাতেই নতুন করে যেন অনুভব করা যাচ্ছে নতুনতর এক বসন্তের হাওয়ার আগমনবার্তা। গত কয়েক বছর ধরেই তার মৃদু স্পর্শ মিলছিল তৃতীয় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বিশ্বায়ন-বিরোধী গণজাগরণের মধ্যে দিয়ে। উন্নত দেশগুলিতেও বিক্ষোভ তীব্র হয়ে উঠছিল বিশ্বায়নের নানা কর্মসূচি এবং জি-৮ গোষ্ঠীর বিশ্ব-মাতব্বরদের বিরুদ্ধে। সেই প্রবণতারই কার্যত গুণগত উত্তরণ ঘটে যায় এবছরের শুরু থেকে— যার প্রকাশ ধরা পড়েছিল আরবের মেরু ঝড়ের গণঅভ্যুত্থানগুলির মধ্যে দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত কিন্তু অব্যাহতই থেকে যায় নতুন নামাবলী গায়ে দিয়ে। তার প্রতিফলন ধরা পড়ে মিশরের মুবারক শাসকের অবসান ঘটলেও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সামরিকচক্রের শাসনের, বিশেষত চক্রান্ত, মিথ্যে প্রচার ও বাহুবলের ভিত্তিতে লিবিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের পদলেহী সারমেয়বৃন্দের ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে। তবুও পুবের প্রবহমান নতুন হাওয়া প্রশমিত হয়নি, বরং ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে।

মেরুঝড়ের ধারাবাহিকতাতে এই হাওয়াই ব্যাপকতর গভীরতা নিয়ে সম্প্রতি বিস্ফোরিত হয়েছে বিশ্ব-পুঁজিবাদের সদর দপ্তর মার্কিন দেশের আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার মূল কেন্দ্র ওয়াল স্ট্রীট দখল করার ডাক দিয়ে। অতীতের সেই প্রায়-বিস্মৃত নভেম্বরের ডাকই যেন নতুন করে ভাষা পেয়েছে এই আন্দোলনের ব্যাপকতার মধ্যে। ইউরোপের বিভিন্ন উন্নত দেশ, বিশেষত বিশ্বলগ্নিপুঁজির এই মুহূর্তের চারণভূমি গ্রীস ও ইতালি থেকে শুরু করে ওয়াল স্ট্রীট দখলের এই অভিযানে অনুপ্রাণিত আন্দোলন সশব্দে ছড়িয়ে পড়েছে উন্নত-অনুন্নত সমস্ত দেশেই। মানুষ এসব দেখে ভাবতে শুরু করেছে : নতুন এক বসন্ত কি তাহলে সত্যিই শুরু হতে চলেছে?

দুস্তর বহু বাধা কিন্তু এখনও রয়ে গেছে নতুন বসন্তের বিজয়বার্তা ঘোষিত হবার মতো বাস্তব পরিস্থিতির বিকাশের পথে। গণজাগরণকে প্রকৃত গণবিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার উপযোগী সংহতি ও সংগঠন এবং তার ভিত্তি হিসেবে একান্ত প্রয়োজনীয় সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল এবং বাস্তবসম্মত কর্মসূচি এখনও গড়ে তোলা যায়নি। তার উপর চলমান আন্দোলনগুলির প্রধান শক্তি তার অন্তর্নিহিত স্বতঃস্ফূর্ততাই কিন্তু তার প্রধান দুর্বলতা হয়ে উঠতে পারে— জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী প্রকৃত বিপ্লবী নেতৃত্বের বদলে সহজেই আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে যেতে পারে পুঁজিবাদের ছদ্মবেশধারী বিকল্প প্রতিনিধিদের হাতে— যেমন গেছে মিশরে, লিবিয়ায় এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও— সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের গণজাগরণের ফসল কুড়োনোর মাধ্যমে।

তাই বসন্তের হাওয়ার সমাগমে ফুল ফুটলেও তার ঈপ্সিত ক্রমবিকাশ সুদূর-পরাহতই থেকে যেতে পারে। সদ্য-অনুভূত সেই বসন্তের হাওয়ায় আন্দোলিত মানুষ কবে সেই বিপদ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পাবে, এবং কীভাবে— সেটাই কিন্তু এই মুহূর্তের সবচেয়ে জরুরি মৌলিক প্রশ্ন।

এই মৃত্যু-উপত্যকা...

কাশ্মীরের বরামুল্লা জেলার পশ্চিমে একটি গ্রাম কিচামা। ১৯৯৪ সালের মে মাস। বরামুল্লায় সেনারা ৫ জন 'সন্ত্রাসবাদী'র মৃতদেহ জঙ্গলে পুড়িয়ে দিতে উদ্যত। খবর পেয়ে কিচামা গ্রামের অধিবাসী, ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের ব্লক প্রেসিডেন্ট মহম্মদ ইউসুফ মালিক পুলিশের এসপি-কে ফোন করে বললেন, মৃতদেহগুলি কিচামা গ্রামে পাঠিয়ে দিতে, তাঁরা ঠিকমতো কবর দেবেন। তাই হলো। সেনাবাহিনী জানিয়েছিল মৃতদেহগুলি বিদেশি জঙ্গিদের। কিন্তু কবর দিতে গিয়ে গ্রামবাসীরা দেখতে পেল, কাশ্মীরী যুবকদের দেহ। এই দিয়ে শুরু হলো কিচামা গ্রামের কবরখানা ভরে ওঠার নতুন কাহিনী।

১৯৯৪ সালে একবার গ্রামে দুটি মৃতদেহ ফেলে রেখে যাওয়া হলো। দেহ দুটিতে অত্যাচারের চিহ্ন। পরে জানা গেল, মৃত শরীর দুটি শ্রীনগরের দুই যুবকের। একটি বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে পুলিশ এদের তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

১৯৯৯ সালে এই কিচামার কবরখানা থেকেই পাওয়া যায় তিন যুবকের হত্যাকাণ্ডের দেহ তিনটি। ২৩ জুন ১৯৯৯ সন্ধ্যা ৭-৪৫ নাগাদ স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের লোকেরা গোলাম মহম্মদ মাত্তু, জাভেদ আহমেদ শাহ ও নাজির আহমেদ গিলকারকে গ্রেপ্তার করে। এরা তিনজন একটা স্কুটার করে ফিরছিলেন এক বিয়ে বাড়ি থেকে। তাদের থানায় ধরে রাখা হল। অভিযোগ যে থানায় অফিসার রসিদ বিল্লা তার ৬ জন সাকরেদকে নিয়ে এদের ওপর অত্যাচার চালায় ও ওদের হত্যা করে। পাঁচদিন পর নিহতদের পরিবার কিচামা থেকে দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে। এ নিয়ে সংবাদপত্রে লেখালেখি হয়। অনুসন্ধান চালাবার জন্য সরকারের ওপর চাপ দেওয়া হয়। আজ, আট বছর পরও, কেসটি আদালতে ঝুলে আছে।

এভাবে ভরে উঠেছে কিচামার কবরখানা। কবরখানায় এখন নামগোত্রহীন কবর রয়েছে ২৩৫ জনের। গ্রামবাসীরা এই কবরখানার নাম দিয়েছেন শহিদ কবরখানা। গ্রামবাসীদের সাক্ষ্য অনুসারে, বেশির ভাগ মৃতদেহই ক্ষতবিক্ষত, বিশেষ করে মুখগুলি। পুলিশ-সেনাবাহিনীর মতে, প্রতিটি দেহই বিদেশি জঙ্গির, গ্রামবাসীরা জানেন, তা নয়। দেহগুলির মধ্যে তারা ৮-১০ জন নিজেদের গ্রামের যুবকের দেহও পেয়েছেন।

কিচামার কবরখানা এখন ভরে গেছে। সেখানে মৃতদেহ রাখার আর কোনো জায়গা নেই। এখন কবর দেওয়া হয় ৭ কিলোমিটার দূরের গ্রাম চেহাল বিমিয়ারে।

চেহাল বিমিয়ারের কবরখানায় ১৩০টি নামহীন কবরে অজানা অচেনা ২০৩ জন মানুষের শরীর শায়িত। এখানে কবর দেওয়া শুরু হয়েছে ২০০৩ সাল থেকে। এর মধ্যে ২০টি মৃতদেহ কবর থেকে তুলে সনাক্ত করা হয়েছে। চেহাল বিমিয়ারের কবরখানাও ভর্তি হয়ে গেছে। সেখানে এখন দ্বিতীয় একটি স্তরে কবর দেওয়া শুরু হয়েছে। বিমিয়ার গ্রামের কবরখানার কেয়ারটেকার আটা মহম্মদ খান বলেন, এই ২০৩ জনের মধ্যে ১০ জন বিদেশি হতে পারে, বাকি সবাই কাশ্মীরী।

কিচানায় ২৩৫ জন, চেহাল বিমিয়ারে ২০৩ জন, লাচিপোরায় ৫০ জন, মায়ানে ২২ জন, পারো গাগার পাহাড়ে ৫২ জন, বিজহামাতে ২০০ জন... নামগোত্রহীন কবরের মিছিল চলেছেই।

২০০৬ সালে নভেম্বর মাস থেকে ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত কাশ্মীর উপত্যকার বরামুল্লা জেলার উরি এলাকার তিনটি তহসিলে সমীক্ষা চালিয়ে এরকম ৯৪০টি নামহীন কবর খুঁজে পেয়েছেন এপিডিপি বা অ্যাসেসিয়েশন অফ পেরেন্টস অফ ডিসঅ্যাপিয়ার্ড পার্সন্স— হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পিতামাতাদের সংস্থা। ২০০৯ সালে আইপিটিকে বা ইন্টারন্যাশনাল পিপলস্ ট্রাইব্যুনাল অন হিউম্যান রাইট্স অ্যান্ড জাস্টিস প্রকাশ করেন 'বেরিড এভিডেন্স'। এতে কাশ্মীরের বন্দিপুরা, বরামুল্লা ও কুপওয়ারা জেলার ৫৫টি গ্রামের ৬২টি জায়গায় ২৭০০ অজানা, নামগোত্রহীন কবরের কথা বলা হয়েছে, যাতে শায়িত আছে ২৯৪৩-র বেশি ব্যক্তির মৃতদেহ। সম্প্রতি, এ বছরের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছে কাশ্মীরের রাজ্য হিউম্যান রাইট্স কমিশনের রিপোর্ট। বন্দিপুরা, বরামুল্লা, কুপওয়ারা ও হান্দাওরা জেলার ৩৮টি কবরখানায় অনুসন্ধান চালিয়ে তারা ২১৫৬টি নামহীন দেহের সন্ধান পেয়েছেন।

গ্রামগুলির অধিবাসীরা জানিয়েছেন, এ ছাড়াও গভীর জঙ্গলের মধ্যে অনেক কবর আছে। সীমান্ত এলাকায় অনেক জায়গায় গর্ত করে তাতে অনেকগুলি মৃতদেহে মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয়।

সারি সারি মৃতদেহ! কারা শায়িত এই কবরগুলিতে? কেমন ভাবে মৃত্যু ঘটলো তাঁদের? কেন তাঁদের মৃত্যুর খবর পৌঁছলো না তাঁদের মা-বাবা-আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে? কেন তাঁরা নামগোত্রহীন হয়ে থাকলেন? এরকম অজস্র প্রশ্ন মনের মধ্যে ভীড় করে।

এপিডিপি জানাচ্ছে, ১৯৯০ থেকে কাশ্মীরে হাজার হাজার হত্যার ঘটনা ঘটেছে, বিশেষত যুবকদের। মোট ৭০০০০ নিহত। তদুপরি, ৮০০০-১০০০০ যুবককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই 'নিখোঁজ' যুবকদের অনেকেই হয়ত এইসব নামহীন কবরে শায়িত।

এধরনের 'নিখোঁজ'দের বলা হয় 'এনফোর্সড

ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স', বলপূর্বক নিখোঁজ। তাদের মা-বাবারা পুলিশ, সেনাবাহিনী, আইনের দরজায় দরজায় কড়া নেড়ে গেছেন। উত্তর মেলে নি। তারপর ২০০৫ সালে তাঁরা উরি এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নানা কবরখানায় নামহীন কবরের কথা জানতে পারেন। শুরু হয় অনুসন্ধান। সেই অনুসন্ধান এখন রাজ্য হিউম্যান রাইট্‌স কমিশনের হাত ধরে একটা স্বীকৃতি পেল।

কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া এখনও বহু দূর। ন্যায় বিচারের কথা বাদই থাক। দেশের ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলি এখন দাবি জানাচ্ছে, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন যেন জম্মু ও কাশ্মীরের অন্যান্য জেলাতেও অনুসন্ধান চালায়। তাঁরা দাবি করছেন, কবরে শায়িত মৃতদেহগুলি থেকে ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখা হোক নিখোঁজ যুবকদের সঙ্গে তা মিলছে কিনা। তাঁরা আরও দাবি জানাচ্ছেন যে, মৃত্যু কেমনভাবে হলো, অত্যাচারের চিহ্ন আছে কিনা, তা জানার জন্য ফরেনসিক পরীক্ষা করা হোক। যে মৃতদেহগুলি বিদেশি জঙ্গিদের বলে দাবি করা হচ্ছে সেগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ অনুসন্ধানের দাবি জানানো হয়েছে। কারণ, আগে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, পুলিশ-মিলিটারি বিদেশি জঙ্গি বলে দাবি জানানোর পরে দেখা গেছে তারা স্থানীয় কাশ্মীরী যুবক।

মানবাধিকার সংগঠনগুলি আরো দাবি জানিয়েছেন যে, যদি প্রমাণ হয় যে নিখোঁজ ব্যক্তিদের মিথ্যা এনকাউন্টারে হত্যা করে তাদের এই অনামা কবরে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে, তাহলে তার জন্য যারা দায়ী তাদের উপযুক্ত কঠিন শাস্তি দিতে হবে। নিহতদের নিকটজনদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। প্রতিটি ঘটনা বিচার করে দিতে হবে এই ক্ষতিপূরণ।

তাঁদের আরো দাবি, যে সব কালাকানুনের জন্য সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনী এই ধরনের কাজ করে পার পেয়ে যাচ্ছে, সেই কালাকানুনগুলি বাতিল করতে হবে।

২০০৭ সাল থেকে ভারত সরকার 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পার্সন্‌স ফ্রম এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়্যারেন্স'-এ স্বাক্ষরকারী, ১৯৯৭ সালে থেকে এ দেশ 'কনভেনশন এগেনস্ট টর্চার অ্যান্ড আদার ক্রুয়েল, ইনহিউম্যান অর ডিগ্রেডিং ট্রিটমেন্ট অর পানিশমেন্ট'-এ স্বাক্ষরকারী। মানবাধিকার সংগঠনগুলির দাবি, রাষ্ট্র সেগুলি মেনে চলুক।

অত্যন্ত সঙ্গত দাবি, সন্দেহ নেই। কিন্তু দাবিগুলি কতটা পূরণ হবে, সে সন্দেহ থেকেই যায়। কারণ, মানবাধিকার লঙ্ঘনই নিয়ম না হয়ে উঠলে কি এ ধরনের ঘটনা দিনের পর দিন ঘটতে পারে, রাষ্ট্রেরই ছত্রছায়ায়?

মিতা দত্ত

বিষও দেব, ওষুধও দেব— নোভার্টিস

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলন্ডের এক লড়াকু শ্রমিক নেতা ছিলেন টি কে ডানিং। পুঁজিবাদ জিনিষটা ঠিক কেমন তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে পুঁজি মুনাফা ছাড়া থাকতে পারে না। শতকরা ১০ ভাগ মুনাফার জন্য পুঁজি যে কোনো জায়গায় লগ্নি হতে রাজি থাকবে, ২০ শতাংশ মুনাফার জন্য বেশ হ্যাংলামি দেখা যাবে, ৫০ শতাংশ মুনাফার জন্য রীতিমত বেয়াদপি শুরু করবে, ১০০ শতাংশ মুনাফার জন্য যে কোনো সামাজিক ন্যায়নীতিকে পায়ে দলে যাবে, আর যদি ৩০০ শতাংশ মুনাফার সম্ভাবনা থাকে তাহলে হেন অন্যায় নেই যা করতে সে পিছপা হবে, এমন কি পুঁজি মালিকের ফাঁসি যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সে পিছিয়ে যাবে না। ডানিং-এর এই মন্তব্যটি মার্কস তাঁর পুঁজি গ্রন্থে ব্যবহার করেছিলেন। আরও দুটো শতাব্দী পার হয়ে গেলেও মুনাফার জন্য পুঁজির এই হিংস্র লালসা এতটুকু কমেনি, বরং বেড়েছে। ব্লাড ক্যান্সারের ওষুধ ইমাটিনিব-এর ওপর নোভার্টিস কোম্পানি যে অন্যায় পেটেন্ট দাবি করছে, মুমূর্ষু মানুষের জীবনের বিনিময়ে যে মুনাফার পাহাড় গড়তে চাইছে, তা এই লালসারই এক উদাহরণ।

ব্লাড ক্যান্সার সহ অন্য কিছু ক্যান্সারের একটি ওষুধ ইমাটিনিব, ১৯৯০-এর দশকে আবিষ্কৃত হয়। এই আবিষ্কারের পেছনে আছে বহু বৈজ্ঞানিকের নিরলস গবেষণা। ব্লাড ক্যান্সার সিএমএল-এর পেছনে যে জিনগত পরিবর্তন আছে তার আবিষ্কার, সেই পরিবর্তন কী ভাবে অসুখটি ঘটায় তার আবিষ্কার, কী ধরনের রাসায়নিক এই ধরনের জিনের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যেতে পারে, সেই সংক্রান্ত আবিষ্কার। অনুসন্ধানটি শুরু হয় ১৯৬০-এর দশকে, বিভিন্ন গবেষণাগারে। আর ইমাটিনিব যৌগটি আবিষ্কার হয় ১৯৯২ সালে। তাই বলা যায় যে শেষ পর্যন্ত যৌগটি আবিষ্কারের সাফল্য যদিও নোভার্টিসের, সব কৃতিত্ব একা নোভার্টিসের নয়। আগেকার অনেক গবেষণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই ওষুধের আবিষ্কার। ওষুধটি ক্যান্সারের প্রথাগত কেমোথেরাপির থেকে বেশ আলাদা। কিছু কিছু ক্যান্সারের, বিশেষ করে সিএমএল (ক্রনিক মায়লয়েড লিউকেমিয়া, এক ধরনের লিউকেমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সার)-এর রোগের কারণ যে রোগগ্রস্ত জিন, সেই জিনে আঘাত করে এই ওষুধ। ফলে শুধুমাত্র রোগগ্রস্ত কোষগুলি ধ্বংস হলেও সুস্থ কোষগুলির কোনো ক্ষতি হয় না। প্রায় পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই রোগী সুস্থ থাকে, প্রায় নীরোগ হয়ে ওঠে, কিন্তু ওষুধটা নিয়মিত ব্যবহার করে যেতে হয়, সারাজীবন ধরে। এই ওষুধ আবিষ্কারের আগে এই ধরনের ব্লাড ক্যান্সার রোগীর ক্ষেত্রে বলা হত, এর বিশেষ চিকিৎসা নেই, মজ্জা প্রতিস্থাপন (অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ও অত্যন্ত বেশি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া) করা যেতে

পারে, তাতেও লাভ সামান্যই। আয়ু দু-চার বছর মাত্র। আর এই ওষুধ আবিষ্কারের পর এখন এই বিশেষ ধরনের লিউকেমিয়া রোগীদের ডাক্তাররা বলেন যে তাঁদের আয়ু হবে স্বাভাবিক। এখানে একটা মজার ব্যাপার বলে নিই। নোভার্টিস প্রথমে এই ওষুধের পরীক্ষানিরীক্ষায় বিশেষ উৎসাহ দেখায় নি, কারণ ওষুধটা ঠিকঠাক কাজ করলেও আমেরিকায় তো প্রতি বছর মাত্র কয়েক হাজার সিএমএল রোগী ধরা পড়ে, এই ক'জন ওষুধ কিনলে তাদের বিশেষ লাভ হবে না। কিন্তু ওই ওষুধ আবিষ্কারের পর এখন আমেরিকায় (এবং সারা বিশ্বে) সিএমএল রোগী বেড়ে চলেছে, কারণ এই ওষুধের কল্যাণে রোগীরা এখন দীর্ঘজীবী হচ্ছেন। তাই প্রতি বছর নতুন রোগীর সংখ্যা আগের মতোই মাত্র কয়েক হাজার থাকলেও আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সিএমএল রোগীর মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আড়াই লক্ষ। আর এই রোগীদের সবাইকেই সারা জীবন ধরে ইমাটিনিব খেয়ে যেতে হবে। ফলত, নোভার্টিসেরও মুনাফার পাহাড়ও ফুলে ফেঁপে উঠছে, যা তারা কল্পনাও করতে পারে নি।

বিভিন্ন ট্রায়ালের পর ২০০২ সালে আমেরিকার এফডিএ সংস্থা ইমাটিনিব ওষুধটি তৈরির ছাড়পত্র দিল। এটি আবিষ্কারের মূল কৃতিত্ব যেহেতু নোভার্টিস কোম্পানির দুই বৈজ্ঞানিকের, তাই নোভার্টিস কোম্পানি ওষুধটির ওপর পেটেন্ট দাবি করে। ওষুধটি বাজারি নাম দেওয়া হয় গ্লিভাক এবং আমেরিকা সহ প্রায় ৩৫টি দেশে নোভার্টিস গ্লিভাকের ওপর পেটেন্ট পেয়ে যায়। যার অর্থ, ওইসব দেশে একমাত্র নোভার্টিস বা তার অনুমোদিত কোম্পানি ছাড়া আর কেউই গ্লিভাক বানাতে পারে না। নোভার্টিস ইচ্ছামতো দামে ওষুধটি বেচে। যে ক্যান্সার-রোগীরা প্রচুর দাম দিয়ে এটি কিনতে পারে তারাই বেঁচে থাকে, বাকিরা মারা যায়। তবে উন্নত বিশ্বে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তুলনায় অনেকটা বেশি।

আমাদের দেশের পেটেন্ট আইন ছিল অন্যরকম। এদেশে কোনো বিশেষ ওষুধের ওপর পেটেন্ট নেওয়া যেত না। কেবল ওষুধ তৈরির বিশেষ পদ্ধতিটির ওপর পেটেন্ট দেওয়া হতো। কিন্তু তার পর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। ভারতের শাসকরা বিদেশি কোম্পানিদের কাছে দেশকে বেচে দেওয়ার আরও অনেক ব্যবস্থা করেছে। WTO বলে বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থরক্ষাকারী যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার সাথে চুক্তি করে দেশের পেটেন্ট আইন বদলে ফেলা হয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে এই নতুন পেটেন্ট আইন লাগু হয়েছে। এর পরেই নোভার্টিস গ্লিভাকের ওপর পেটেন্টের আবেদন জানায়। গ্লিভাকের মূল যৌগটি যেহেতু সেই ১৯৯২ সালেই আবিষ্কৃত হয়ে গেছে তাই ভারতে এখন নতুন করে আর তার ওপর পেটেন্ট পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। নোভার্টিস কোম্পানি তাই ওষুধটিকে একটু পরিবর্তন করে একটা নতুন ওষুধ হিসাবে হাজির করছে এবং পেটেন্ট চাইছে। এইখানেই একটা আইনি জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। ভারতের নতুন পেটেন্ট আইনের ৩(ঘ) ধারায় বলা হয়েছে যে, কোনো ওষুধ যদি আগেই আবিষ্কার হয়ে থাকে তাহলে তার সামান্য পরিবর্তন করলেই পেটেন্ট পাওয়া যাবে না। তাই নোভার্টিসের পেটেন্টের আবেদন খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু নোভার্টিস তাতে চুপ করে বসে থাকবে কেন? তার ঘাঘু আইনজীবীরা ৩(ঘ) ধারাকেই নাকচ করে দেবার জন্য চেন্নাই হাইকোর্টে মামলা করে। ভারতের বেশ কয়েকটি নাগরিক সংগঠন, ক্যান্সার রোগীদের সংগঠন নোভার্টিসের আবেদনের বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা করে। মামলায় নোভার্টিসের হার হয়। ৬-৮-২০০৭ তারিখে চেন্নাই হাইকোর্টের রায়ে ভারতীয় পেটেন্ট আইনের ৩ (ঘ) ধারা নাকচ করার জন্য নোভার্টিসের আবেদন খারিজ হয়ে যায়।

এই মামলাটি বহু কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, পেটেন্ট না পেলেও ২০০৩ সাল থেকেই নোভার্টিস গ্লিভাক বিক্রির একচেটিয়া অধিকার এদেশে ভোগ করে আসছে, যদিও অন্য কিছু কোম্পানি জেনেরিক নামে একই ওষুধ অনেক সস্তায় বিক্রি করে। এখন ২০০৫-এর পেটেন্ট আইন সংশোধনের পর নোভার্টিস যদি গ্লিভাকের ওপর পেটেন্ট না পায় তবে তার এদেশে গ্লিভাক বিক্রির একচেটিয়া অধিকারও খারিজ হয়ে যাবে। আর যদি পেটেন্ট পায় তাহলে এই ওষুধের দাম হবে অত্যন্ত বেশি। ভারতীয় কোম্পানিদের তৈরি এই ওষুধটি কিনতে রোগীদের খরচ পড়ে প্রতিমাসে ৫০০০ থেকে ১০০০০ টাকা। আর সেখানে নোভার্টিসের গ্লিভাকের দাম পড়ে মাসে ১,২০,০০০ টাকা। অন্য কোম্পানিগুলোর ওষুধ বন্ধ হয়ে গেলে ভারতের কজন রোগী এই দাম দিয়ে ওষুধ কিনে খেতে পারবেন? কী হবে তাঁদের? নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত তো বটেই, অতি-বিত্তশালীদের বাদ দিলে উচ্চবিত্তদেরও নাগালের বাইরে চলে যাবে এই চিকিৎসা।

ভারতের ক্ষেত্রে আরেকটি বিশেষ ব্যাপারও আছে। পাশ্চাত্যে এই বিশেষ ধরনের লিউকেমিয়া (সিএমএল) কম হলেও ভারতে কিন্তু এই লিউকেমিয়াই হয় সবচেয়ে বেশি। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্যে এই রোগটি বেশি বয়সের রোগ হলেও ভারতে অসুখটি দেখা দেয় সাধারণত রোগির ৩০-৪০ বছর বয়সে, যখন সে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী, অথবা শিশু পালনকারী এক জননী। কম বয়সে অসুখটি হওয়ার ফলে তাকে ওষুধ খেতে হবেও অনেক বেশি বছর ধরে। কারণ, আগেই বলেছি, সুস্থ থাকার জন্য ওষুধটি সারা জীবন ধরে খেয়ে যেতে হয়।

শুধু ভারত নয়, ভারতে প্রস্তুত সস্তার ইমাটিনিব বাঁচিয়ে

রেখেছে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের ক্যান্সার (সিএমএল) রোগীদের, কারণ অনেক দেশ, অনেক এনজিও-ই ভারত থেকে সস্তার ইমাটিনিব কিনে বিভিন্ন দেশে রোগীদের হাতে এই ওষুধটি তুলে দেন। মামলায় নোভার্টিস জিতে গেলে একই পয়সা দিয়ে তখন এর ১০ শতাংশ রোগীর হাতেও ওষুধ দিতে পারবেন না তাঁরা।

শুধু ইমাটিনিব কেন, ক্যান্সার ও এইডস-এর অনেক অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিকের মতো জীবনদায়ী নানান ওষুধও দেশি কোম্পানিগুলি তৈরি করতে পারে বলে ভারতের, এবং ভারত ছাড়াও পৃথিবীর আরও অন্তত ৩০টি গরিব দেশের মানুষ তুলনামূলকভাবে কম পয়সায় ওষুধগুলি পেতে পারেন। পেটেন্ট আইনের ৩(ঘ) ধারা বাতিল হলে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি অনেক পুরনো ওষুধও সামান্য পরিবর্তন করে পেটেন্ট করে নেবে। ওষুধের দাম এত বাড়বে যে তা গরিব মানুষের নাগালের অনেক বাইরে চলে যাবে।

নোভার্টিসও চুপচাপ বসে নেই। তারা চেন্নাই হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গেছে, সেখানে মামলা লড়ছে। ফল এখনো বের হয় নি। ইতিমধ্যে নোভার্টিস যে কত মানবিক, মুমূর্ষু রোগিদের কষ্ট কত বোঝে তার প্রমাণ রাখতে জোরদার প্রচার শুরু করেছে। তারা নাকি অনেক মানুষকে বিনামূল্যে ওষুধ দেয়, তারা ওষুধের দাম বাড়াতে চাইছে শুধু তাদের জন্য যারা ওই দাম দিয়ে ওষুধ কেনার ক্ষমতা রাখে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি তথ্য দিলে নোভার্টিস কোম্পানিকে চিনতে সুবিধা হবে। ভারতে প্রতিবছর ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হন প্রায় ৪০,০০০ মানুষ, আর নোভার্টিস এ পর্যন্ত মাত্র ৬০০০ জনকে বিনাপয়সায় ওষুধ দিয়েছে। আর সেও তো প্রচারের স্বার্থে। পেটেন্ট পেয়ে গেলে যদি এই কজনের বিনাপয়সার ওষুধও বন্ধ হয়ে যায় কারোর কিছু বলার থাকবে না। দাতব্য তো, কোনো দাবি নেই।

নোভার্টিস কোম্পানির আর একটি দিকও আছে। তারা কীটনাশক বিষ তৈরি করে। তাদের তৈরি বিষ মানুষের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর তা পরীক্ষা করার জন্য তারা পয়সা দিয়ে গরিব মানুষ ভাড়া করে। তাদের তৈরি একটি কীটনাশক বিষ নিশ্চিতভাবে মানুষের দেহে ক্যান্সার, বিশেষত ব্লাডক্যান্সার, তৈরি করে। নোভার্টিসের ব্যবসাটা বেশ ভালো। প্রথমে কীটনাশক বিষ বেচে ব্লাড ক্যান্সার তৈরির হার বাড়াবে, তারপর সেই ব্লাড ক্যান্সারের ওষুধ বেচবে, পেটেন্টও চাইবে।

এই সব কোম্পানিগুলির মানুষ মারার অধিকার কাড়তে না পারলে দেশের মঙ্গল হবে না।

শুভ্রকেতন বসু / মিতা দত্ত

সোনি সোরিদের গণতন্ত্র

ভারতের সংবিধানের কোন্ পাতায় ব্যক্তি-স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার বিবৃত হয়েছে? ছত্তিশগড়ের পুলিশ-প্রশাসন বোধ হয় তার খবর রাখে না। ভারতবর্ষের মধ্যভাগে তিনটি রাজ্য— মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং ঝাড়খন্ড— প্রশাসনিক রীতিনীতির বিচারে এরা সম্ভবত মধ্যযুগেই অবস্থান করছে। ভারতবর্ষের এই মধ্যাঞ্চল প্রাকৃতিক এবং অরণ্য সম্পদে অত্যন্ত ধনী এবং একই সঙ্গে দারিদ্র অধ্যুষিত। ভারতবর্ষে যত খনি আছে, তার ১০ শতাংশ মধ্যপ্রদেশে। সব মিলিয়ে দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ খনি এই তিন রাজ্যে। খনিজের আকর্ষণে দেশি-বিদেশি কোম্পানিগুলি গ্রাস করছে জল-জমি-জঙ্গল। মিত্তাল, জিন্দাল, টাটা, এসার, বালাজি, বিড়লা, ভূষণ, বালকো, রুংতা, গোয়েঙ্কা— উদারনৈতিক অর্থনীতির এই স্বর্ণযুগে কে নেই এই ''স্বর্ণ অভিযানে''? একদিকে মুনাফার পাহাড় গড়ে উঠছে, অপরদিকে বিনাশ করা হচ্ছে বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ। কেন্দ্রীয় 'অরণ্য সংরক্ষণ আইন' যে বছর চালু হয়, সেই ১৯৮০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে মোট ১২ লক্ষ হেক্টর বনভূমি উন্নয়নের গ্রাসে গেছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র খনি প্রসারণের কারণে, ২০০৫ সালের মধ্যে অরণ্য ধ্বংস হয়েছিল ৯৫০০০ হেক্টর। বর্তমানে বছরে গড়ে ৮৬৩৯ হেক্টর বন ধ্বংস হচ্ছে। তিন দশক আগে অরণ্য সংরক্ষণ আইন বলবৎ হওয়া সত্ত্বেও, অরণ্য ধ্বংসের হার বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। উন্নয়ন শুধু প্রকৃতিকে উচ্ছেদ করে নি, প্রকৃতি-নির্ভর ৬ কোটি মানুষকেও উচ্ছেদ করেছে। এদের আড়াই কোটিই আদিবাসী।

রাজ্যওয়ারী উচ্ছেদের পরিসংখ্যান দুর্লভ। বিশেষ কিছু সমীক্ষা অনুযায়ী, পূর্বাপর অবিভক্ত রাজ্য ধরে, ছত্তিশগড় এবং ঝাড়খন্ড অঞ্চলে, উন্নয়নের অভিঘাতে উচ্ছেদ হয়েছে যথাক্রমে ১৫ লক্ষ এবং ১০.৫ লক্ষ মানুষ। সর্বদা উন্নয়নের চিন্তা করার ফলে, সরকার এদের পুনর্বাসনের ভাবনা মাথায় আনতে ভুলে গিয়েছে। যাই হোক, এই উন্নয়নের ফলশ্রুতিতে, মধ্যভারতের এই রাজ্যগুলি লাভ করেছে নিম্নতম মানব উন্নয়ন সূচক, পুলিশি নির্যাতন, অমানবিক প্রশাসন এবং মাওবাদীদের ঘাঁটি। দারিদ্রের বিচারে ভারতের সবথেকে ক্ষুধার্ত রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, পরবর্তী ক্রমাঙ্কে আছে ঝাড়খন্ড, বিহার, ছত্তিশগড়। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড— এই তিনটি রাজ্যেই এখন ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টি।

চলতি বছরের কয়েকটি ঘটনা।

মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ। ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়ারা জেলার তিনটি প্রত্যন্ত গ্রাম— মোরপল্লী, টিমাপুর, তারমেটলা। সিআরপিএফ, কোবরা এবং কোয়া কম্যান্ডোদের একটি দল মাওবাদীদের সন্ধানে গ্রামগুলিতে ঢোকে। তাদের গোয়েন্দারা খবর দিয়েছিল, গ্রামগুলিতে মাওবাদীরা ডেরা বেঁধেছে। পাঁচদিন

ধরে তারা গ্রামগুলিতে তাণ্ডব চালায়। কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায় নি। তিনটে গ্রাম তারা জ্বালিয়ে দেয়। তিনশো কুঁড়েঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। তিনজন মহিলা ধর্ষিতা হন। তিনজন গ্রামবাসী খুন হয়। ধানের গোলা ধ্বংস হয়। গ্রামবাসীদের শেষ সম্বল মুরগি, ছাগল সহ গয়নাগাঁটি ও কয়েক হাজার টাকা লুঠ হয়ে যায়। মাওবাদীরাও বদলা নিতে ছাড়ে নি। ছাউনিতে ফেরার পথে নিরাপত্তা বাহিনী আক্রান্ত হয়। সংঘর্ষে তিনজন কোয়া কম্যান্ডো এবং মাওবাদী দলের এক সদস্য নিহত হন। সেদিন রাত্রে নিরাপত্তা রক্ষীরা গ্রামেই রাত কাটায়। পরের দিন ভোররাত্রে ছাউনিতে প্রত্যাবর্তনের আগে ৫০টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। একজনকে খুন করে, আরও এক গ্রামবাসীকে থানায় ধরে নিয়ে যায়।

তিরিশ বছরের আদিবাসী যুবক কামলু ভার্দা পেশায় শিক্ষক। ছত্তিশগড়ের প্রান্তিক জেলা নারায়নপুরের কুতুল গ্রামে বাস। ফেব্রুয়ারী মাসের কোন এক সময়ে মাওবাদীরা তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। প্রমোদ এবং মুলচাঁদ নামে দুইজন ব্যক্তিও নিখোঁজ হয়। তারা পেশায় ড্রাইভার। এরা নিখোঁজ হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ কোন ভূমিকা নেয় নি। পুলিশের বক্তব্য, তারা গুজবটা শুনেছিল, কিন্তু কেউ অভিযোগ দাখিল না করায় তাদের কিছু করার ছিল না। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে মাওবাদীদের তরফে জনৈক রাকেশ প্রেস বিবৃতিতে জানায়, এক বছর আগে কৃত 'দুষ্কর্মের' জন্য তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, 'জনাতনা সরকারের' দুই মহিলা কর্মীকে যে গুন্ডার দল ধর্ষণ এবং খুন করে, ড্রাইভার দুজন সেই গুন্ডা দলের সঙ্গে জড়িত ছিল। অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল কী না, গ্রামবাসীরা জানে না। কামলু না কী ২০০৪ সাল থেকে পুলিশের চরবৃত্তি করছিল। কামলুর সহ-শিক্ষকরা বলেন, ''একদম মিথ্যা কথা। ওদের কাজের প্রতিবাদ করেছিল বলে কামলুকে খুন হতে হয়েছে। দাদারা স্কুলে এসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য বরাদ্দ চাল যখন দাবি করেছিল, কামলু তার প্রতিবাদ করেছিল। তারপর আবার ২০০৭ সালে, কামলু যখন মোহান্দি গ্রামে শিক্ষকতা করছিল, তখন স্কুলের খেলার মাঠকে বধ্যভূমি হিসাবে ব্যবহার করার প্রতিবাদ করে।'' ১০ ফেব্রুয়ারি মাওবাদীরা 'ভূমকল আদিবাসী বিদ্রোহ (১৯১০)' দিবস উদযাপিত করেছিল। উন্নয়নে মাওবাদীরা বাধা দিচ্ছে, এই বলে কামলু ঐ অনুষ্ঠানে যোগদান করা থেকে বিরত থাকে। পরের দিনই তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

ছত্তিশগড়ের বস্তার জেলার জগদলপুরের মহারাণী সরকারি হাসপাতালে ৭০ বছরের বৃদ্ধ মদরুরাম সোরি ডান পায়ে গুলির ক্ষতের জন্য চিকিৎসাধীন। কলকাতায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে তাঁর মেয়ে সোনি সোরির এখন চিকিৎসা চলছে। মদরুরাম মাওবাদীদের গুলিতে আহত। আর সোনি সোরি মাওবাদীদের মদত দেওয়ার অভিযোগে ছত্তিশগড় পুলিশের হাতে বন্দিনী।

তিন ভাইয়ের সর্বজ্যেষ্ঠ মদরুরাম নিজে বেশি লেখাপড়া শিখতে পারে নি। তার ছোটভাই সোনুরাম 'বাদে বেরমা' গ্রামের প্রথম স্নাতকোত্তর এবং সরকারি কর্মচারী। কনিষ্ঠ নন্দরাম ঐ এলাকার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। মদরু নিজে তিনবার বাদে-বেরমা গ্রামের সরপঞ্চ নির্বাচিত হয়েছেন। ঐ অঞ্চলের পাঁচটির মধ্যে তিনটি গ্রামের মানুষ মাওবাদীদের সভায় যোগ দিতে শুরু করে। কিন্তু দুইটি গ্রামের অধিবাসীরা যায় নি। মদরুর বক্তব্য, ''মাওবাদীদের ধারণা হয়েছিল, আমার জন্যই লোকজন তাদের সঙ্গে যায় নি।'' ২০০৮ সালে মাওবাদীরা গ্রামের বাইরে এক বৃদ্ধকে ছুরি মেরে হত্যা করে। থানায় অভিযোগ রুজু করা হয়। মদরুর বিশ্বাস, এটাও মাওবাদীদের রাগের কারণ। চলতি বছরের ১৪ জুন রাত্রে মাওবাদীরা মদরুর বাড়ি আক্রমণ করে। মদরুকে গুলি করে। ঘরদোর তছনছ করে। সোনাদানা, ধানের বস্তা, গরু লুটপাট করে। সবশেষে সবাইকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ফেলে রাখে। পরের দিন সকালের আগে কেউ ফিরতে পারে নি। আঘাত পেলেও মদরু বেঁচে যায়।

মাস দুয়েক বাদে অদ্ভুত এক কাহিনী শোনা যায়। মাওবাদীদের দ্বারা যে পরিবার আক্রান্ত, সেই পরিবারেরই মেয়ে সোনি সোরি সম্বন্ধে পুলিশ অভিযোগ করে যে সে 'নক্সালদের সাহায্যকারী'। সোনি বিবাহিতা, তিন সন্তানের জননী এবং স্কুল শিক্ষিকা। ২০১০ সালের ৮ জুলাই, দান্তেওয়ারাতে মাওবাদীদের আহূত দুইদিনব্যাপী বন্ধের সময়ে স্থানীয় একটি থানা ও কংগ্রেস নেতা অবদেশ গৌতমের বাড়ি আক্রান্ত হয়। আক্রমণে কংগ্রেস নেতার দুই আত্মীয় নিহত হন। ১১ জুলাই সোনির স্বামী সহ ছয় জনকে পুলিশ ঐ ঘটনায় লিপ্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। সোনি এবং সোনির ভ্রাতুষ্পুত্র লিঙ্গারাম কোডপির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়। অদ্ভুত ব্যাপার, এক বছরের বেশি সময় ধরে সেই পরোয়ানা কার্যকর করা হয় নি। সোনি স্কুলে গেছে, মাইনে নিয়েছে, শিক্ষকতা চালিয়ে গেছে।

২০১১ সালের ৯ সেপ্টেম্বর খবর রটে যে, পুলিশ 'জনাকীর্ণ বাজার' থেকে, এসার-এর কন্ট্রাক্টর বি কে লালা ও লিঙ্গারামকে গ্রেপ্তার করেছে। লালা না কি মাওবাদীদের 'সুরক্ষা অর্থ' খাতে লিঙ্গারামকে ১৫ লক্ষ টাকা দিচ্ছিল। পুলিশের মতে 'কট রেড হ্যান্ডেড'। লিঙ্গারাম শিক্ষিত আদিবাসী যুবক। দিল্লীতে পড়াশোনা করেছে। বিখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা হিমাংশু কুমারের 'বনবাসী চেতনা আশ্রমের' সঙ্গে যুক্ত ছিল। পুলিশ হিমাংশু কুমারের আশ্রম ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। লিঙ্গারামকেও ছেড়ে দেয় নি। ২০০৯ সালে ৪০ দিন সে জেল হেপাজতে কাটিয়েছে। আদালতের আদেশে মুক্তি পায়। ৯ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তারের পর হিমাংশু কুমার অভিযোগ করেন, ''ও (লিঙ্গারাম) একজন সহজ-

সরল আদিবাসী। নক্সালদের অপছন্দ করে। এমন কী ও নক্সালদের পতাকাও পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং নক্সালরা ওকে সতর্কও করে দেয়। তিনটি গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনায় সরকারের জড়িত থাকার প্রমাণ ওর হাতে আছে। ওরা (পুলিশ) ভয় পাচ্ছে, ও সেগুলো সিবিআই-এর হাতে তুলে দেবে। সিবিআই ঘটনাটার তদন্ত করছে। সেই কারণে পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করেছে। ...এসপিও হতে চায় নি বলে পুলিশ ২০০৯ সাল থেকে ওকে হয়রান করছে। ও আর ওর পরিবার সেই সময় থেকেই পুলিশি নির্যাতন ভোগ করে আসছে।''

সোনি বাড়ি ছেড়ে পালায় এবং দুদিন খুবই কষ্টকর ভ্রমণের পর দিল্লীতে পৌঁছতে সক্ষম হয়। সোনির ধারণা ছিল, দিল্লীতে পৌঁছতে পারলে, গ্রেপ্তার এড়ানো সহজ হবে। মানবাধিকার কর্মীদেরও সাহায্য পাওয়া যাবে। কিন্তু গ্রেপ্তার এড়ানো সম্ভব হয় নি। কিছুদিন গা ঢাকা দিতে পারলেও শেষ পর্যন্ত ৪ অক্টোবর দিল্লীতেই সোনি গ্রেপ্তার হয়। ছত্তিশগড় পুলিশের আবেদনে সাড়া দিয়ে দিল্লী পুলিশ হন্যে হয়ে সোনিকে খুঁজছিল। মানবাধিকার কর্মী কবিতা শ্রীবাস্তবের বাড়িতেও পুলিশ হানা দেয়। গ্রেপ্তারের আগে সোনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যে ঘটনার বর্ণনা রেখে গেছে বা গ্রেপ্তারের পর আদালতে যা বিবৃতি দিয়েছে, তার সঙ্গে পুলিশের ভাষ্যের কোন সঙ্গতি নেই। সোনি জানায়, ৮ সেপ্টেম্বর, মানকর নামে স্থানীয় থানার এক কনস্টেবল সোনির সঙ্গে দেখা করে বলে যে, লালাকে ধরার ব্যাপারে সে যেন লিঙ্গারামকে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য বোঝায়। লিঙ্গা মাওবাদী সেজে লালার থেকে টাকা নেবে আর তা পুলিশকে দিয়ে দেবে। মানকর কথা দেয় যে, সোনি যদি লিঙ্গাকে রাজি করাতে পারে, তাহলে পুলিশ কেস থেকে সোনির নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে সোনি মানকরের প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। কিন্তু মানকর একজন মাওবাদীর নাম করে জোর করে তার ফোন থেকে লালাকে ফোন করে। পরের দিন ৯ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টা নাগাদ এক গাড়ি ভর্তি সাদা পোষাকের পুলিশ মগরুরামের বাড়িতে হাজির হয়ে লিঙ্গাকে তুলে নিয়ে যায়। বারবার তাদের পরিচয়পত্র দেখতে চাইলেও, তারা দেখায় নি। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার, থানার ওসি সহ বিভিন্ন মহলে সোনি যোগাযোগ করে জানতে চায়, লিঙ্গাকে যারা তুলে নিয়ে গেছে, তারা পুলিশ কী না। সকলেই পুলিশ পাঠানোর কথা অস্বীকার করে। পরের দিন সকালে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশ হয় যে, লালার থেকে টাকা নেওয়ার সময় লিঙ্গাকে বাজার থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সোনি না কী 'পলাতক'। এর পরই সোনি বাড়ি থেকে পালানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

দিল্লীতে 'তেহেলকা' পত্রিকার অফিস থেকে সোনি কনস্টেবল মানকরকে ফোন করে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অভিনয় করে সে মানকরকে বলে, ''আপনি কেন আমাকে আর লিঙ্গাকে এই গোলমেলে ব্যাপারে জড়ালেন? বলুন, আপনি আমার ফোন থেকে লালাকে ফোন করেছিলেন কী না। আপনি তো জানেন, পুলিশ লিঙ্গাকে আমাদের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেছে। লালাকেও তার বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বাজার থেকে নয়। কোন লেনদেনের ব্যাপার ছিল না, আপনিই আমাদের ফাঁসিয়েছেন। বলুন সত্যি কী না।'' চরম বিস্ময়ের ব্যাপার, মানকর সব কিছু শুধু স্বীকারই করল না, এটাও বলল যে, টাকাটা আসলে লালার বাড়ি থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে। মানকর সোনিকে আরও কিছুদিন দিল্লীতে থেকে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। সোনিকে সে আশ্বাস দিয়েছিল যে, তার বিরুদ্ধে প্রকৃত কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পুলিশের হাতে নেই। তেহেলকা জানিয়েছে, তাদের কাছে সোনি-মানকরের কথোপকথনের রেকর্ড আছে।

গ্রেপ্তারের পর সোনি আহত হয়। তার পিঠে এবং ঘাড়ে আঘাত লাগে। পুলিশের ভাষ্যে, সোনি বাথরুমে পড়ে গিয়েছিল। সোনি আদালতকে জানায়, ছত্তিশগড়ে পুলিশ হেপাজতে তার মৃত্যুর আশঙ্কা আছে। ছত্তিশগড়ের বাইরে সে চিকিৎসার আবেদন জানায়। নিম্ন আদালতে তার আবেদন খারিজ হয়ে গেলেও, সুপ্রিম কোর্টের আদেশে সোনিকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আনা হয়েছে।

এগুলো কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। কাশ্মীর থেকে কেরালা, মহারাষ্ট্র থেকে মণিপুর, সমস্ত দেশ জুড়ে বিরাজ করছে দুটি রাজ— মাফিয়া রাজ এবং পুলিশ রাজ। নব্য উদারনীতির নামে আমদানি হয়েছে মাফিয়া অর্থনীতি। শুধু কর্পোরেট-সিন্ডিকেটের যথেচ্ছ লুঠ করার স্বাধীনতা থাকবে কেন? গণতন্ত্রে লুঠ করার অধিকার আছে সবার। তবে জোর থাকা চাই। পুঁজির জোর, ক্ষমতার জোর, রাজনৈতিক জোর। প্রতিবাদ তো উঠবেই। প্রতিবাদ করা মানুষের স্বভাব। প্রতিবাদকে দমন করার জন্য রাষ্ট্র আছে, পুলিশ আছে, আছে হরেক সামরিক আইন, ইউপিএ, রাজ্যগুলির নিজস্ব দমনপীড়ন আইন। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রে দুটি সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকার ভোগ করে না। যারা প্রতিবাদী, আর যারা নিঃস্ব ও নিম্নবর্গ। কল্পিত অপরাধে এখানে বিনায়ক সেনের যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাদেশ হয়, বিনা অপরাধে গণ-সাংস্কৃতিক কর্মী ও গায়ক জিতান মারান্ডির ফাঁসির আদেশ হয়, সালওয়া জুডুমের মতো মাফিয়া বাহিনী রাষ্ট্রীয় মদতে পুষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রেও আদিবাসী, প্রতিবাদীদের স্থান নেই। তাদের স্থান জেলে। গরিব গ্রামবাসীদের উপর পুলিশ-যৌথবাহিনীর জুলুম অব্যাহত। মাওবাদীরা প্রতিবাদী। রাষ্ট্র তাদের প্রতি নির্মম। কিন্তু তারাও তো প্রতিবাদী-হন্তারক। মারীচ দশা থেকে সাধারণ মানুষকে তারাও তো মুক্তি দিতে রাজি নয়।

পরিচয় কানুনগো

ভূ-রাজনীতির কয়েকটি ঘটনা

জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ভূ-রাজনীতি (Geo-Politics) প্রভাব ফেলে। এ প্রভাব কখনও হয় বিপুল, কখনও বা এ প্রভাব গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে সংকট তৈরি করে।

তাই, জনগণের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম গড়ে তোলার ও এগিয়ে নেওয়ার পথে ভূ-রাজনীতি বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূ-অর্থনীতি ও ভূ-রণনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও সচেতনতা দরকার। এ প্রয়োজন কেবল নেতৃস্থানীয়দের জন্য নয়, কর্মী ও সর্বসাধারণের জন্যও। কারণ, কর্মী ও সর্বসাধারণ যত বেশি তথ্য পাবেন, যত ওয়াকিবহাল থাকবেন, গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস, সংগ্রাম ও বি-নির্মাণ তত বেশি সবল হবে। ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত-বিভ্রান্ত করে সে প্রয়াস ব্যর্থ করা তত বেশি কঠিন হয়ে পড়বে। এছাড়া, খেয়াল রাখা দরকার যে, গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াসের প্রাসঙ্গিক অন্যতম দাবি হচ্ছে জানার অধিকার, জানার গণ-অধিকার। এর সাথে আবার দুটি বিষয় যুক্ত। সেগুলি হচ্ছে : স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। এ দুটি বিষয় জনগণের জানার সুযোগকে যেমন বিস্তৃত-প্রসারিত করে; তেমনি জনগণের প্রতিপক্ষের ছল-চাতুরি-ষড়যন্ত্র লেনদেন করার সুযোগ সংকুচিত করে, জনগণের প্রতিপক্ষের মুখোশ খুলে ফেলতে সাহায্য করে।

দুই

এবার দৃষ্টি দেওয়া যাক এ লেখার মূল বিষয়, অর্থাৎ সাম্প্রতিককালে ভূ-রাজনীতিতে ঘটে যাওয়া/ঘটতে থাকা কয়েকটি ঘটনার দিকে। এসব ঘটনাগুলোর মাত্র কয়েকটি সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করা হলো। সংক্ষেপে উল্লেখের প্রধান কারণ, ঘটনাগুলো থেকে পাঠক নিজেই বুঝতে পারবেন, ব্যাখ্যা দরকার হবে না।

(১) প্যালেস্টাইনের প্রেসিডেন্ট আব্বাস জাতিসংঘে প্যালেস্টাইনের সদস্যপদের জন্য আবেদন করেছেন। এ আবেদনের প্রতি রয়েছে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন। যুক্তরাষ্ট্র এই আবেদনের বিরোধিতা করতে থাকায় মধ্যপ্রাচ্য সহ বিভিন্ন অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে/হচ্ছে। এতে ২০০৯ সালের জুন মাসে কায়রোতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ওবামার উচ্চারিত প্রতিশ্রুতির সাথে কাজের সামঞ্জস্যহীনতা জনসমক্ষে প্রস্ফুটিত হয়েছে। সেই সাথে, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মতপার্থক্য আবার সামনে এসেছে। এই মতপার্থক্য প্রকাশ হয়েছে তখনই, যখন লিবিয়ায় এই শক্তিবর্গ একসাথে থাকার চেষ্টা করেছে, চেষ্টা চালিয়েছে ঐক্যবদ্ধভাবে লিবিয়ায় যুদ্ধ চালানোর।

প্যালেস্টাইনের দিক থেকে এ ছিল রাজনৈতিক লড়াই, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, কূটনীতির জগতে। শাসন/আধিপত্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যে শাসিতের/আধিপত্যাধীনের কাছে শাসকের/আধিপত্যকারীর বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখা একটি আবশ্যিক শর্ত।

(২) লিবিয়ায় ন্যাটো হামলায় গদ্দাফি জমানার অবসানের পর ১২ সেপ্টেম্বর রুশ চিফ অফ জেনারেল স্টাফ আর্মি জেনারেল নিকোলাই মাকারোফ মস্কোয় সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিশ্বে রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে ও অপ্রত্যাশিত মোড় নিচ্ছে। তাই, সম্ভাব্য সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য রাশিয়ার সেনাবাহিনীকে তৈরি থাকতে হবে। পরিস্থিতি বিশেষ করে পাল্টাচ্ছে উত্তর আফ্রিকায় ও মধ্যপ্রাচ্যে। এই অঞ্চলে যা ঘটেছে, তা আগে থেকে বুঝতে পারা কঠিন ছিল। এই অঞ্চলে ঘটনাগুলো বিকশিত হয়েছে খুব দ্রুত গতিতে। সেখানে কী ঘটবে, তা এখন কেউ বলতে পারবে না। তবে সকল রাষ্ট্রের জন্যই এগুলো একটি সংকেত। আমাদেরকে, সামরিকবাহিনীকে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে।

তিনি জানান যে, কালেকটিভ সিকিউরিটি ট্রিটি অর্গানাইজেশন (সিএসটিও) বা যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি সংস্থাভুক্ত দেশগুলো স্ব-স্ব নিরাপত্তা বাহিনী ব্যবহারের একটি যৌথপন্থা শীঘ্র প্রণয়ন করবে। রাশিয়া, কাজাখস্তান, কিরঘিজস্তান ও তাজিকস্তানের সামরিক বাহিনী নিয়ে যৌথ সামরিক মহড়া প্রসঙ্গে তিনি একথা বলেন।

তিনি জানান : এ সামরিক মহড়ায় সিএসটিও-ভুক্ত দেশগুলোর সামরিক বাহিনী ছাড়াও রাষ্ট্রীয় সামরিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত সকল ক্ষমতা-কাঠামোই অংশ নেবে। রাশিয়ার ক্ষেত্রে বলতে পারি, আমরা শিল্প খাতে একটি জটিল মোতায়েন উদ্যোগ দ্রুত শুরু করার ব্যাপারে সার্বিকভাবে দেশের সামরিক সংগঠনকে যাচাই করতে চাই।

তিনি আরো জানান : আজ কয়েকটি সামরিক ইউনিট মোতায়েনের আরেকটি পৃথক পরিকল্পনা আমরা শুরু করছি।

(৩) এই ঘটনার পরে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে লিবিয়া বিষয়ে উত্থাপিত একটি খসড়া প্রস্তাবের রাশিয়া ও চিন ভোট দেয়। নিরাপত্তা পরিষদের ইউরোপীয় সদস্যদের উত্থাপিত প্রস্তাবে সমর্থন ছিল যুক্তরাষ্ট্রের। প্রস্তাবটি ছিল সিরিয়ার বাশার আসাদ সরকারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের হুমকি সংক্রান্ত।

লিবিয়ার উদাহরণ দিয়ে রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদে বিতর্কে বলে , রুশ প্রেসিডেন্টও এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন : লিবিয়া যা হয়েছে সেটা সিরিয়ায় হোক তা আমরা চাই না।

(৪) রুমানিয়া যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন বিষয়ের দুই দেশ গত ১৩ সেপ্টেম্বর একটি চুক্তি সই করেন। এধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অংশ বিশেষ তুরস্কেও স্থাপন করা হবে বলে প্রকাশিত হয়েছে। রুমানিয়ায় এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বসানো হবে, সে দেশে ডেবেসেলুতে বিমানঘাঁটিতে। একই সাথে, এই ঘাঁটিতে যুক্তরাষ্ট্রের দুশো সৈন্য থাকবে।

প্রয়োজনে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করে পাঁচশো করা হবে।

এই প্রসঙ্গে রাশিয়ার একাডেমি অফ জিওপলিটিক্যাল ইস্যুজ-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, সামরিক বিশেষজ্ঞ কন্সটানটিন সিভকফ এক সাক্ষাৎকারে বলেন : যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো সারি সারি ঘাঁটি বসিয়ে রাশিয়াকে ঘিরে ফেলার নীতি অব্যাহত রেখেছে। আমেরিকানরা এখন আমাদের দেশকে রণনীতিগত দিক থেকে প্রধান বৈরী মনে করে। এমন কি তারা এটা গোপন করে না। তাদের কাজ হচ্ছে, আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রগুলোকে নিষ্ক্রিয় করা এবং মহাসমুদ্রমালার প্রধান অঞ্চলগুলো থেকে আমাদের সরিয়ে দেওয়া। এক্ষেত্রে এলাকাটি হচ্ছে কৃষ্ণসাগর। রুমানিয়া হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বোড়ে। রুমানিয়ার শাসকরা টিকে আছে স্রেফ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতের কারণে। একই কথা পোল্যান্ড সম্পর্কেও খাটে। ফলে, রুশ সীমান্ত বরাবর তুরস্ক থেকে রুমানিয়া ও পোল্যান্ড হয়ে নরওয়ে পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষেপণাস্ত্র বিস্তৃত।

(৫) ন্যাটোর ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে একটি যৌথ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠনের ব্যাপারে রাশিয়া, চীন ও ইরান আলোচনা করছে। বার্তাসংস্থা মেহরয়ের দেওয়া এই খবরটা সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশ করে ইরানের পত্রিকা *কায়হান*। এই তিনটি রাষ্ট্রের উপসংহার হচ্ছে যে, ইরান ও উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র বিষয়ক যে ক্ষমতার কথা যুক্তরাষ্ট্র বলে আসছে তা অজুহাত মাত্র; এ অজুহাত দেখিয়ে ন্যাটো যে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা বলে আসছে, তার আসল লক্ষ্য রাশিয়া ও চীন। তাই, এই তিন দেশ বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বের সাথে আলোচনা করছে।

(৬) যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রবার্ট গেটস্ ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে বার্ষিক নিরাপত্তা আলোচনায় অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের বলেছিলেন : যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় আরো বড় আকারে সামরিক উপস্থিতি চায়। অস্ট্রেলিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা প্রসারে সাহায্য করবে। ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা, 'মহাকাশ নজরদারি' ইত্যাদি বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

গোটা দক্ষিণ চীন সাগরকে চীনের অংশ হিসেবে দেখিয়ে মানচিত্র প্রকাশ করে চীন। ব্যাপারটি ঘটে ২০১০ সালের গোড়ার দিকে। এর পর থেকে এই অঞ্চল নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ বেড়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিষয়ক একজন উর্ধ্বতন কর্তা একই সময়ে সাংবাদিকদের বলেন : আমাদের বাহিনী কেবল উত্তর-পূর্ব এশিয়া কেন্দ্রিক হয়ে না থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারত মহাসাগরের দিকেও যে তাকাবে, তা নিশ্চিত করার পথ খুঁজেছে পেন্টাগন। কারণ, এই অংশের নিরাপত্তা পরিবেশ আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই সময়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন : আমরা চীনের অভ্যুদয় এবং পৃথিবীতে চীন কেমন শক্তি হবে তা নিয়ে আলোচনা করব।

তিন

এখানে মাত্র কয়েকটি ঘটনা উল্লেখিত হলো। এ ধরনের আরো ঘটনা রয়েছে, যেগুলো ইঙ্গিত বহন করে ভূ-রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ সমীকরণের/শক্তি বিন্যাসের ও পুনর্বিন্যাসের। এগুলো কোনো কোনোটি একেবারে নতুন।

উল্লেখিত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়ার পরে মানচিত্রের দিকে খেয়াল দিলে, প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক তথ্যগুলো খেয়াল করলে, ঘটনাবলীর তাৎপর্যগুলো আরও স্পষ্ট হবে।

এর সাথে যদি ঘটনার স্থান এবং ঘটনার সংশ্লিষ্টদের সাথে স্বদেশের শাসকদের, শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন অংশের এবং স্বদেশে পুঁজি/বিভিন্ন পুঁজির বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক (সমূহের) সংযোগ চিহ্নিত করা হয়, তাহলে স্বদেশে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম সংক্রান্ত ভাবনায়/প্রয়াসের এ সবের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারা সহজ হবে।

চার

ওপরে উল্লেখিত ঘটনাবলী আরো তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে, যদি এগুলোকে বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠা সংকটগুলোর প্রেক্ষিতে স্থাপন করা যায়। এই সংকটকে ব্যাপকতরভাবে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : আর্থিক তথা অর্থনৈতিক সংকট, পরিবেশ-প্রতিবেশ সংকট ও রাজনৈতিক সংকট। এগুলো পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত এবং একটি অন্য দুটিকে প্রভাবিত করছে। একই সাথে এগুলো প্রভাবিত করছে ভূ-রাজনীতির প্রধান 'ক্রিয়াশীল' শক্তিগুলিকেও। এবং এগুলো প্রভাব ফেলছে দেশে-দেশে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে, সংগ্রামের শত্রু-মিত্র নির্ধারণে, কর্মসূচি নির্ধারণে। তাই, এসব প্রসঙ্গ বিবেচিত হওয়া দরকার।

ফারুক চৌধুরি

ভূপেন হাজারিকার জীবনাবসান

গত ৫ নভেম্বর অসমের বিখ্যাত গায়ক, গীতিকার ও সুরকার ভূপেন হাজারিকার জীবনাবসান হলো। গণনাট্য আন্দোলন গড়ে তোলার প্রথম যুগে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের পাশাপাশি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন এই শিল্পী। যদিও পরবর্তীকালে বাণিজ্যিক জগতের হাতছানিতে সাড়া দেন তিনি। তবে সেই পর্বেও তিনি বেশ কিছু অনবদ্য গান রচনা করেছেন। গণনাট্য পর্বে তাঁর অবদানের জন্য এই শিল্পীর প্রতি অনীক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।

প্রবন্ধ

মার্কিন মলুকেও সদর দপ্তরে কামান দাগার তূর্যধ্বনি

দীপ্র চৌধুরী

প্রতিটি দিনকে দখল করো
দখল করো প্রতিটি মুহূর্ত...
—দখল করো ওয়াল স্ট্রীট...
চার সমুদ্র জাগছে
ফুঁসে উঠছে মেঘ আর তরঙ্গ
পাঁচ মহাদেশ দুলছে
গর্জে উঠছে বাতাস আর বজ্র।
ধ্বংস করতেই হবে সব কীটপতঙ্গ—
দখল করতেই হবে ওয়াল স্ট্রীট...
আমাদের শক্তি অপ্রতিরোধ্য।

— নিউ ইয়র্কের জুকোত্তি পার্কে অসংখ্য মানুষের জমায়েতে সোচ্চার দাবি উঠছে : *ওয়াল স্ট্রীট দখল করো*। এই একটিমাত্র দাবির মধ্যেই নিহিত রয়ে গেছে একদিকে সেদেশের সমগ্র অর্থনীতির উপর কর্পোরেট পুঁজির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও ক্রমবর্ধমান মুনাফার বিরুদ্ধে এবং অন্য দিকে ব্যাপক সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান বেকারি,দারিদ্র্য, জনকল্যাণকর সরকারি ব্যয়-বরাদ্দে বিপুল ছাঁটাই ও চরমতম অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে, একই সঙ্গে লগ্নিপুঁজি ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, ঘৃণা ও ক্রোধ। নানা বয়সের বহু মানুষ এই একটিমাত্র দাবিকে সামনে রেখেই স্লোগান তুলছে, মিলেমিশে ছড়িয়ে পড়ছে নানা সুরের নানা গান, জাজ সঙ্গীতের ঝংকার। সুর দিয়ে গাইছে মাও সে তুং-এর উপরে উদ্ধৃত কবিতাটিও— ভাবা যায় (ওয়াল স্ট্রীট দখলের ধুয়োটি আন্দোলনকারীদের সংযোগ করা)! অথচ ঠিক সেটাই ঘটছে— একদিন নয়, দিনের পর দিন, প্রায় সাত সপ্তাহ ধরে, গত ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে— সেদেশের অন্তত দু'শো পঞ্চাশটি শহরে। এই মুহূর্তে ওয়াল স্ট্রীট দখল করার একটিমাত্র দাবিতে কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব ছাড়াই লক্ষ লক্ষ মানুষের ধারাবাহিক সমাবেশ ঘটছে। সারা দুনিয়াতেই যেহেতু বিরাজ করছে কার্যত সেই একই শোষণ ও বঞ্চনার ছবি, ফলত মানুষের সেই মৌলিক দাবি ছড়িয়ে পড়ছে সারা দুনিয়ায়— অন্তত ৮০টি দেশের ৯৫১টি শহরে। গত বছর খানেক ধরে নতুন বসন্তের যে হাওয়া বইতে শুরু করেছিল, প্রথমে আরব দেশগুলিতে— যেখানে তার দোলাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনরোষে দীর্ঘ দিনের একনায়কদের পতন ঘটলেও শেষ পর্যন্ত আবার উল্টোরথের পালা শুরু হয়েছে। তারপর ইউরোপের দেশগুলিতে— যেখানে তার ধাক্কায় শাসকদের জনকল্যাণমূলক কাজে রাষ্ট্রীয় ব্যয় কাটছাঁট করার চক্রান্ত কিছুটা থমকে দাঁড়িয়েছে; অবশেষে তা প্রবাহিত হতে শুরু করলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তেও। সেই দেশে, যা বিভিন্ন দেশের বিত্তবান ও সুবিধেভোগী অসংখ্য মানুষের স্বপ্নের দেশ, যা নাকি দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দেশ, গায়ের জোরে যে দেশ সারা দুনিয়ায় ছড়ি ঘোরায়। মার্কিন এই গণউত্থানের অনুপ্রেরণা আবার উদ্দীপিত করে তুলছে অন্য সব দেশের মানুষকে। লক্ষণীয় যে, মিশরের কায়রোয় তাহরির পার্কে কার্যত সূচনা হয়েছিল যে আরবের মেরুঝড়ের, সেই 'তাহরির' কথাটির অর্থ 'মুক্তি'। আর নিউইয়র্কের যে জুকোত্তি পার্কে ফেটে পড়েছে মার্কিন জনতার সোচ্চার বিক্ষোভ, সেই 'জুকোত্তি' শব্দটির অর্থও 'মুক্তি'। মিশরের মতো এখানেও জমায়েতের ডাক এসেছিল একটি ই-মেলের মাধ্যমে, একটি পত্রিকা 'অ্যাডবাস্টার্স' (*Adbusters*) নব্বই হাজার মানুষের কাছে ডাক পাঠিয়েছিল: *ওয়াল স্ট্রীট দখল করো*। সামাজিক বৈষম্যের চরম শিকার প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ বিপুল মানুষ সে ডাকে সাড়া দিয়েছিল। তার পরেরটা তো এখন ইতিহাসেই ঢুকে গেল।

কিন্তু কেন এই বিক্ষোভ এবং কেন তা শুধু ওয়াল স্ট্রীট দখল করার একটিমাত্র দাবিকে সামনে রেখে? ওয়াল স্ট্রীট মানে মার্কিন স্টক এক্সচেঞ্জের মূল কেন্দ্র, কার্যত আমেরিকা তথা সারা দুনিয়ার অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র— বিশ্ব কর্পোরেট পুঁজির সদর দপ্তর। আন্দোলনের শুরুর দিকে সংবাদ-মাধ্যমের রিপোর্টাররা অনেক মাথা খাটিয়েও বুঝে উঠতে পারছিল না, কেন হঠাৎ ওয়াল স্ট্রীট দখল করার ডাক দেওয়া হলো। দখলকারীদের উত্তরটা ছিল নিতান্তই সোজাসাপ্টা— বিশ্বজোড়া কর্পোরেট পুঁজির মূল ঘাঁটি ওয়াল স্ট্রীট সারা দেশটাকে, দেশের সমস্ত সম্পদ দখল করে নিয়েছে, তাই আমরা সেই ওয়াল স্ট্রীটটাকেই দখল করতে চাই! বস্তুত ওয়াল স্ট্রীট দখল করাটাকেই আন্দোলনের মূল লক্ষ্যবস্তু হিসেবে সামনে তুলে ধরে এবং আন্দোলনকে দেশের 'এক শতাংশের বিরুদ্ধে ৯৯ শতাংশের বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়ে আন্দোলনকারীরা দেশের চরম বৈষম্যকে মানুষের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে যে অর্থনৈতিক ব্যাপার-স্যাপারগুলি এতদিন সাধারণ মানুষের সামনে ছিল নিতান্তই ধোঁয়াটে, এই আন্দোলন সেই অস্পষ্টতার কুয়াশা সরিয়ে দিয়ে সমসাময়িক লগ্নি-ভিত্তিক পুঁজিবাদকে একটি নৈতিক প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছে।

ফলত, ধরা পড়ে যাচ্ছে, অর্থনৈতিকভাবে একদিকে চরম সর্বনাশের গর্ভে নিমজ্জিত হচ্ছে সেদেশের '৯৯ শতাংশ' মানুষ। গত বছর মার্কিন সেন্সাস ব্যুরোর হিসেবে সেদেশের ৪.৬৬ কোটি মানুষ, মোট জনসংখ্যার ১৪.৩ শতাংশ— *প্রতি ৬*

জনে একজন— ছিল দারিদ্র্যসীমার নিচে। সেপ্টেম্বর '১১-তে সেটা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫.২ শতাংশ। আর এই নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ব্যুরোর হিসেব, মাত্র দু'মাসের মধ্যে সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬ শতাংশ, মোট ৪.৯১ কোটি। সরকারি দারিদ্র্য ভাতা না থাকলে দারিদ্র্যসীমার নিচের জনশতাংশ বেড়ে দাঁড়াত ২৮.৬ শতাংশ। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রেসিডেন্ট ওবামার জমানায় সরকারি দারিদ্র্য ভাতা ক্রমশ কমিয়ে আনার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। গত আগস্টে তাঁর সাথে রিপাবলিক্যান পার্টির যে সমঝোতা হয়েছে, তার ফলে আগামী এক দশকে প্রাসঙ্গিক সরকারি ব্যয় আরও কয়েকশো ট্রিলিয়ন ডলার কমে যাবে। হিসেব মিলেছে, এদের মধ্যে আবার ১.৯ কোটি মানুষ রয়েছে 'গভীর দারিদ্র্য'(deep poverty)-র মধ্যে— অর্থাৎ যারা দারিদ্র্য-সীমার অর্ধেকেরও কম আয় করে— খাদ্য, বাসস্থান ও জল প্রভৃতি জীবনের প্রয়োজনগুলি পর্যন্ত মেটাতে হিমসিম খায়। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের হিসেবমতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাদের সংখ্যা এখন ২ কোটি।

বয়সের ভিত্তিতে মানুষের অবস্থা আলাদা করে দেখলে নভেম্বর '১১-র উপরোক্ত হিসেবে ধরা পড়ছে, ৪০ বছরের কম বয়সের মানুষদের প্রকৃত গড় আয় ১৯৮৪-র তুলনায় এক-তৃতীয়াংশ হয়ে গেছে। তাই বলে সেই অর্থ বেশি বয়সের মানুষদের হাতে যায়নি, গেছে কর্পোরেট পুঁজির ভাগে। আর ৪০ বছরের বেশি বয়সের মানুষদের দারিদ্র্য হারের বৃদ্ধি গত এক দশকে ৯ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫.৯ শতাংশ।

২০১০-এ সেদেশের শ্রমিকদের পারিবারিক (৪ জনের) গড় আয় (২৬,৩৬৪ ডলার) ছিল সরকারি দারিদ্র্যসীমা ২২,০২৫ ডলার থেকে সামান্যই বেশি। বিখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ উইলিয়াম ট্যাবের হিসেবে, মুদ্রাস্ফীতিকে হিসেবে ধরলে প্রকৃত মজুরি ১৯৭৩-এর স্তরে নেমে গেছে।

অধিকাংশ লোকের এই অর্থনৈতিক দুরবস্থার পিছনে প্রধান ভূমিকা অবশ্যই বেকার সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধির। মোট পুঁজির বড়ো অংশটাই এখন বিনিয়োজিত হচ্ছে লগ্নিতে, শিল্পোৎপাদনে যাচ্ছে খুবই সামান্য অংশ। ফলে নতুন চাকরির ক্ষেত্র তৈরিই হচ্ছে না। তার উপর শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রেও যত উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে, উৎপাদন হয়ে পড়ছে ততই 'কর্মহীন', ফলে বেকারদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই শতকের শুরু থেকেই সেদেশে এটা ঘটছে। বর্তমানে জনসংখ্যার ১৬.৩ শতাংশ বেকার। গত চার বছরে অন্তত এক কোটি বেকার বেড়েছে। তার ওপর ওবামা প্রশাসনের স্বাস্থ্য ইত্যাদি সংক্রান্ত সংস্কারের ফলে বর্তমানে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের স্বাস্থ্যবীমা নেই।

সাধারণ মানুষের অবস্থা যখন ক্রমেই খারাপ হচ্ছে, তখন অন্য দিকে, সবচেয়ে উঁচু আয়ের স্তরের লোকেরা দেশের মোট আয়ের ২৩.৫ শতাংশ উপার্জন করছে— যেটা আবার ১৯২৮ সালের পরে সবচেয়ে বেশি। গত তিন দশকে তাদের আয় যত বেড়েছে, ঠিক ততটাই কমেছে সবচেয়ে কম আয়ের ৮০ শতাংশ লোকের আয়। সবচেয়ে উঁচু আয়ের ২০ শতাংশের হাতে রয়েছে দেশের ৮৪ শতাংশ সম্পদ। যে হেজ-তহবিল মার্কিন অর্থনীতির ২০০৮-এর মন্দার পিছনে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল, সেগুলির ২৫ জন ম্যানেজারের গত বছর আয় হয়েছিল ২৫০০ কোটি ডলার, অর্থাৎ এক লক্ষ পঁচিশ হাজার কোটি টাকা। *ফোর্বস্*-এর দেওয়া পরিসংখ্যানে জানা যাচ্ছে, পুঁজিপতিদের মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি আয় বাড়ছে লগ্নিপুঁজির মালিকদের— শিল্পপতিদের আয় অনেক বেশি পিছিয়ে পড়েছে। *ফরচুন* পত্রিকার বিচারে ৫০০ ধনীতম কর্পোরেশনের মধ্যে ৩০ শতাংশ কার্যত গত তিন বছরে কোনো ট্যাক্সই দেয় নি।

এর মধ্যেই গত ২০০৮-এ ফাটকাবাজি-উদ্ভূত অর্থনৈতিক মন্দার সংকট ঘনিয়ে এসেছিল। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, মন্দার হাত থেকে মার্কিন অর্থনীতিকে বাঁচানোর জন্য লগ্নিপুঁজির হাতে 'উৎসাহ' (stimulus) খাতে লক্ষ লক্ষ ডলার অনুদান দেওয়া হবে। সরকারের কাছে মানুষের শেষ প্রত্যাশা ছিল সরকার অন্তত 'উৎসাহ' খাতের টাকা লগ্নিপুঁজির মালিক ও প্রশাসকদের উপর ট্যাক্স চাপিয়ে আদায় করবে, আর মন্দায় বিপদগ্রস্ত মানুষকেও অনুদান দেবে। গরীব মানুষরা তা তো পায়ই নি, উপরন্তু তারা যেসব সরকারি অনুদান পেত সেগুলি পর্যন্ত ক্রমশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ও হচ্ছে। আর অন্য দিকে লগ্নিপুঁজির মালিকদের বাঁচাতে লক্ষ লক্ষ কোটি ডলার রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে খরচ করা হয়েছে।

মার্কিন লগ্নিপুঁজির মালিকরা, সরকারে তাদের স্বার্থরক্ষা-কারীরা এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত বৃহৎ সংবাদমাধ্যমগুলি প্রথমে এই আন্দোলনকে গুরুত্বই দেয়নি, নিতান্ত অবহেলায় দায়সারাভাবে এর যৎকিঞ্চিৎ খবর ছেপেছে। কিন্তু যখন প্রমাণিত হলো যে, এ আন্দোলনকে ও তার ব্যাপকতাকে সহজে দমানো যাবে না, তখন থেকে তারা নানা অবান্তর কূট প্রশ্ন তুলে জনমতকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। সরকারও শেষ পর্যন্ত বহু জায়গায় কড়া হাতে আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করছে। পুলিশ লাঠি চালাচ্ছে বা শত শত লোককে গ্রেপ্তার করছে। কিন্তু আন্দোলনকে দমানো যাচ্ছে না। বরং তার পিছনে জনসমর্থন বাড়ছে। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে *নিউইয়র্ক টাইমস্*-এর সমীক্ষায় ৪৪ শতাংশ মানুষ আন্দোলনের পক্ষে ও ২৭ শতাংশ বিপক্ষে মত দিয়েছে— বাকিরা দ্বিধাগ্রস্ত। কিন্তু ৬৬ শতাংশ লোক ধনী-দরিদ্র বৈষম্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এবং ৮৯ শতাংশ রিপাবলিক্যান বা ডেমোক্র্যাট দুটি দলই জনস্বার্থের বিরোধী ও আস্থাস্থাপনের অযোগ্য মত দিয়েছে।

২৫ অক্টোবর ওকল্যান্ডে পুলিশের ছোঁড়া হ্যান্ডগ্রেনেডে স্কট ওলসন প্রচণ্ড আহত হন। ইরাক যুদ্ধের পূর্বতন এই সৈন্যটির

ওয়াল স্ট্রীট দখলকারীরা নিজেরা শুরুতে যা বলছিলেন

এই যে বিপ্লবী, প্রগতিশীল আর স্বপ্নাতুর কল্পস্বর্গের বাসিন্দারা, শুনছেন... আমরা সবাই রয়েছি বিরল এক সংকটের মধ্যে এবং একটা সুযোগের মুহূর্তে। পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলিকে এই মুহূর্তে ছারখার করে দিচ্ছে তাদেরই তৈরি এক আর্থিক লগ্নিপুঁজির দানব। আমরা রয়েছি এমন একটা ফেটে পড়ার মানসিকতার মধ্যে যখন আমরা দুলছি ক্রুদ্ধ অস্বীকৃতি আর আকস্মিক ভয়ের মধ্যে। মনে হচ্ছে কিছু যেন একটা ঘটতে চলেছে, যা আমাদের সামনে দুনিয়ার অর্থনৈতিক কাণ্ডকারখানার একান্ত প্রয়োজনীয় রূপান্তর আর সে-সম্পর্কিত নতুন চিন্তার অবকাশ তৈরি করে দেবে। ঘটনাবলী আমাদেরকে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বরের *ওয়াল স্ট্রীট দখল*-এর লড়াইয়ের দিকেই চমৎকারভাবে ঠেলে দিচ্ছে।

আমরা যারা স্থিতাবস্থার বাঁ দিকে রয়েছি, আমরা কি পারবো কিছু নতুন কায়দা খুঁজে বের করতে? তাজা ও খোলা মনে রণাঙ্গণের দিকে এগিয়ে যেতে?

এবং 'পুঁজিবাদের বিলোপ চাই' বা ওই ধরনের কোনো বস্তাপচা বহু-ব্যবহৃত স্লোগান তুলে যদি আমরা বোকার মতো আগেই আমাদের হাতের তাস দেখিয়ে দিই, তাহলে রণনীতিগতভাবে আমরা কিন্তু বিপদে পড়ে যাবো— আমাদের 'তাহরির আন্দোলন' আরও একটা অতি-বাম দ্রুত-বিস্মরণযোগ্য কার্যকলাপের মতোই মুখ থুবড়ে পড়বে। কিন্তু তার বদলে আমরা যদি সহজ-সরল একটা দাবি— অনেকটা সেই ট্রয়ের ঘোড়ার মতো— তোলার দূরদৃষ্টি দেখাতে পারি... যেটা হবে গভীর, কিন্তু অত্যন্ত নির্দিষ্ট ও বাস্তব-সম্ভব, যা এমনকি প্রেসিডেন্ট ওবামার পক্ষেও উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না... যা স্পষ্ট করে দেবে ওয়াল স্ট্রীট কর্তৃক আর্থিকভাবে মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর দখলদারির ঘটনাটিকে এবং সামনে তুলে ধরবে গ্লাস-স্টিগাল অ্যাক্টের পুনঃপ্রবর্তনের মতো, বা সমস্ত আর্থিক লেনদেনের উপর এক শতাংশ ট্যাক্স বসাবার, বা ওয়াশিংটনে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে কর্পোরেট দুর্নীতির সরকার-নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্ত চালাবার প্রস্তাবকে, কিংবা একইরকম কোনো সৃজনশীল কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে বাস্তবসম্মত বিকল্পকে— যা উঠে আসবে *ওয়াল স্ট্রীট দখল*-এর জন্য ব্যাপক মানুষের জমায়েত থেকে। আমরা যদি তারপর মেরুদণ্ড খাড়া রেখে সাহসের সাথে সেখানে থেকেই যেতে পারি দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, আমাদের লক্ষ্যের প্রতি বিপুল সংখ্যক নাগরিকের লড়াকু ও ঐক্যবদ্ধ সমর্থন অর্জিত হওয়া পর্যন্ত, তাহলে প্রেসিডেন্ট ওবামা বাধ্য হবে সাড়া দিতে... এবং এইভাবে আমরা হয়তো পেরে যাবো আমেরিকার পক্ষে প্রকৃত সত্যকে উপলব্ধির সেই নির্ধারক মুহূর্তটি নির্মাণ করতে, এবং গৃহীত হবে প্রথম পদক্ষেপ আমাদের ঈপ্সিত সেই আমূল পরিবর্তনের দিকে— যা হয়তো জন্ম দেবে সমস্ত রকম কর্তৃত্বের বন্ধনমুক্ত আমাদের সেই স্বপ্নের আমেরিকার।

তাই আসুন, বিশেষ কোনো পার্টির ছত্রছায়া ও বস্তাপচা সব মতান্ধতা বিসর্জন দিয়ে আমরা তাহরির (অহিংসা), সিনট্যাগমা (ধৈর্য) ও পিউরেতা দেল সল (গণসংসদ) থেকে রণনীতিগত শিক্ষা নিই।

আসুন, ১৭ সেপ্টেম্বর আমরা বুনে দিই আমেরিকায় নতুন এক প্রতিরোধের সংস্কৃতির বীজ যা শেষ পর্যন্ত রূপ নেবে চিরস্থায়ী এক গণতান্ত্রিক গণজাগরণে।

১৭ সেপ্টেম্বর আবার দেখা হবে।

সঙ্গে তাবু নিয়ে আসতে ভুলবেন না কিন্তু।

ওয়াল স্ট্রীট দখল-এর বুলেটিন ***http://www.adbusters.org*** *থেকে*

উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রতিবাদ ফেটে পড়েছে। ২ নভেম্বরে ওকল্যান্ডে সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়েছে, সরকারের পরোক্ষ তল্পিবাহক শ্রমিক ইউনিয়নগুলি পর্যন্ত জনমতের চাপে বাধ্য হয়েছে সেই ধর্মঘটে সামিল হতে।

সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ খবর মিলেছে ওহিও, মিসিসিপি, আরিজোনা, আইওয়া, নিউজার্সি প্রভৃতি বেশ কয়েক রাজ্য থেকে— যেখানে শাসকশ্রেণীর উত্থাপিত লক্ষ লক্ষ মানুষের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ছাঁটাই করার প্রস্তাব জনমতের চাপে আইনসভাগুলিতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

ওয়াল স্ট্রীট দখল করার দাবিতে এই আন্দোলন মার্কিন দেশে ১৯২০-৩০ দশকে ব্যাপক বামপন্থী ও প্রগতিশীলদের আন্দোলনের ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনেছে, ফিরিয়ে এনেছে ১৯৬০-এর দশকের অধিকার আন্দোলনেরও স্মৃতি। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম দুনিয়ার উন্নত দেশগুলিতে শ্রমিকশ্রেণী সহ ব্যাপক জনগণের পুঁজির পক্ষে আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত 'অতি-বাম' ভুয়া মার্কসবাসীদের তত্ত্বও ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। পুঁজিবাদকেই মানব সভ্যতার শেষ পর্যায় এবং মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধানের সর্বরোগহরবটিকা হিসেবে তুলে ধরার অলীক গল্প আজ মূলত প্রত্যাখ্যাত— এবং এটাই হচ্ছে আন্দোলনের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক।

আন্দোলনের মূল শক্তি নিহিত রয়েছে ব্যাপক স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে। এটাই আবার আন্দোলনের মূল দুর্বলতা। গত দু-তিন দশক ধরে সারা পৃথিবীতে বিশ্বায়ন-বিরোধী ব্যাপক জনজাগরণের মূলত দলনিরপেক্ষ চরিত্রের সঙ্গে এই আন্দোলনকে তুলনা করে বলা যায়, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ফসল তুলেছে পুঁজিরই এক বা অন্য রাজনৈতিক তল্পিবাহকরা— ব্যাপক মানুষের স্বার্থ কার্যত পদদলিত হয়েছে (আমাদের চেনা উদাহরণ সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম)। সুনির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচি-ভিত্তিক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে না পারলে এই ওয়ালস্ট্রীট দখলের আন্দোলনেরও সম্ভবত সেই ভবিতব্যই অপেক্ষা করছে।

তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে। মার্কিন দেশ-সহ উন্নত দেশগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রবাদীদের সক্রিয়তা কার্যত অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই আন্দোলনের মধ্যে কোনোরকম মতাদর্শবিরোধীরা ছাড়াও রয়ে গেছে নিহিলিস্ট, জনকল্যাণবাদী, ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র সহ নানা মতের বামপন্থী, এমনকি মার্কসবাদীরাও। এই আন্দোলন তাদের সামনে যে পরিসর তৈরি করে দিয়েছে, মতাদর্শভিত্তিক দৃঢ়তা ও অধ্যবসায় নিয়ে এগোতে পারলে সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল-ভিত্তিক কর্মসূচি এবং তা কার্যকর করার মতো সংগঠন গড়ে তুলতে পারলে সত্যিসত্যিই একদিন ওয়ালস্ট্রীট তথা গোটা দুনিয়াটাকেই দখল করা সম্ভব হবে— এই প্রত্যয়ে আস্থাবান না হবার কিন্তু কোনো যুক্তি নেই।

স্মরণ : নরুল হুদা মির্জা

বাংলাদেশের বামপন্থী নেতা নুরুল হুদা মির্জা গত ১ নভেম্বর ঢাকায় ৮৫ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত জটিলতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। 'ছোটিভাই' নামে সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত এই জনপ্রিয় মানুষটির রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশকের শেষ ভাগে, দেশবিভাগ ও উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলনের শেষ দিকে, তাঁর জেলা দিনাজপুরে। তাঁর পিতা, বঙ্গীয় আইন পরিষদের (নিম্ন ও উচ্চ উভয় কক্ষেই) সদস্য মৌলভী কাদের বক্শ, বঙ্গবাসী কলেজের যুগান্তর ও অনুশীলন দলের কাজে সক্রিয় স্বদেশি অধ্যাপকবৃন্দ এবং দিনাজপুরে তেভাগা আন্দোলনের নেতা হাজী দানেশের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য তাঁকে বামপন্থী আন্দোলনের দিকে টেনে আনে।

দিনাজপুরে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল। ১৯৪৮ সালে কলকাতা থেকে ফিরে আসার পর দিনাজপুরে রিক্সা ধর্মঘট সংগঠিত করার জন্য তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। জেলে তিনি কমিউনিস্ট কর্মীদের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পান। ১৯৫৪-র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কমিউনিস্ট পার্টির একমাত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেলেও, কারারুদ্ধ থাকার কারণে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন নি।

পরবর্তী সময়ে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি দায়িত্ব নেন এবং ১৯৬৬-তে সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ন্যাপের মুখপত্র 'জনতা'-তে তাঁর সাংবাদিকতা এবং সত্তরের দশকে রচিত গ্রন্থ '*গণচীনের গণকমিউন*' ও '*মার্কসবাদের অ-আ-ক-খ*' তাঁকে রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় করে তোলে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সংঘ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

ছোটি ভাই ১৯৭২ থেকে আমৃত্যু *অনীক*-এর গ্রাহক ও ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

ওমর তারেক চৌধুরী

ভুল সংশোধন

অনীক-এর জুলাই'২০১১ সংখ্যায় ৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিতপ্যাট্রিস লুমুম্বার কবিতা '*আফ্রিকার বুকে একটি সকাল*' (অনুবাদ: সরোজ দত্ত)-এ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল আছে। ভুলগুলো দেখিয়ে দেওয়ার জন্য পাঠকবন্ধু সুব্রত চৌধুরী-কে ধন্যবাদ।

পৃষ্ঠা-৩৮: কবিতার ২ লাইনে 'ভস্মশেষ' হবে 'ভস্মাবশেষ'।

পৃষ্ঠা-৩৯: প্রথম কলাম: শেষ থেকে ৪ লাইনে 'সকাল' হবে 'শপথ'।

পৃষ্ঠা-৩৯: প্রথম কলাম: শেষ থেকে ১২ লাইনে আছে 'চমকে জেগে উঠেছে সারা দুনিয়া', পরের লাইনে যুক্ত হবে : 'বিস্মিত আতঙ্কে কান পেতে শুনেছে'।

পৃষ্ঠা-৩৯: দ্বিতীয় কলাম: ৫ লাইনে আছে 'শুকিয়ে যাবে তোমার মুখের উপর ছিটানো থুতু—', পরের লাইনে যুক্ত হবে : 'শুকিয়ে যাবে তোমার চোখের জল'।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১১ সংখ্যার ৪৯ পৃষ্ঠায় শঙ্খজিৎ দাসের কবিতার শেষ লাইনে 'প্রজাতি' হবে 'প্রজাপতি'।

প্রবন্ধ

আমরা ৯৯ শতাংশ

আনু মুহাম্মদ

সময় এসেছে অভিমুখ পরিবর্তনের।
আমাদের দেশকে ১ শতাংশের দখলদারি থেকে মুক্ত করতে হবে।

সারা পৃথিবীতে যে নতুন নতুন গণ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে তা দেখে উৎসাহ জাগে। সর্বত্র ৯৯ শতাংশ তাদের নিজস্ব জমি, সম্পত্তি ও জীবন পুনর্দখল করতে উঠে দাঁড়িয়েছে। এই লেখায় আমি বাংলাদেশের কথা বলতে চাইছি, এদেশের ১ শতাংশকে চিহ্নিত করতে চাইছি, বিশ্বের ১ শতাংশের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক কী তা দেখাতে চাইছি, আর এইভাবে সত্যিকারের পরিবর্তনের জন্য বিশ্ব-স্তরে ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের ওপর জোর দিতে ও আমাদের, বিশ্বের ৯৯ শতাংশকে, জোরদার করতে চাইছি। এই কাহিনী বাংলাদেশের, কিন্তু তা কোনো বিশেষ কাহিনী নয়। প্রান্তের অনেক দেশ সম্পর্কেই এমন কাহিনী বলা যায়।

বাংলাদেশের বয়স এখন ৪০ (১৯৭১-২০১১)। স্বাধীনতার ৪০-তম বছরে আমাদের কী করা উচিত? জবাবটা সহজ নয়, সবার ক্ষেত্রে একও নয়। প্রশ্নটা কঠিনও, কারণ এই ৪০ বছরের বর্ণনাও সবার ক্ষেত্রে এক নয়। এ দেশ জন্ম নিয়েছিল রক্তের সাগরে। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। গণহত্যার শিকার হয়েছেন, অথবা দেশকে মুক্ত করতে প্রাণ দিয়েছেন। কী উদ্‌যাপন করবো আমরা? দীর্ঘ চার দশকে কী করতে পেরেছি? দেশটাকে আমরা কোথায় নিয়ে যেতে চাইছি? এবং, কার জন্য?

আমাদের স্মৃতিকে জীবন্ত রাখতে হবে আমাদের। গণহত্যার বীভৎসতা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সমর্থনপুষ্ট পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের তাঁবেদার বাঙালিদের করা ঘৃণ্য অপরাধগুলি ভুলতে পারি না আমরা, ভোলা উচিতও নয়। মানুষের স্বপ্নগুলিও ভোলা উচিত নয়। মানুষ যখন যুদ্ধে যাচ্ছিলেন, ভয়ঙ্কর শক্তিশালী ঐ সামরিক শক্তিকে প্রতিরোধ করছিলেন, মা-রা যখন তাঁদের ছেলেদের দেশের জন্য মৃত্যু বরণ করতে পাঠাচ্ছিলেন, সেই সময়কার স্বপ্নগুলি। মা-বোন-কৃষক-শ্রমিক-ছাত্রদের এই সব আকাbWাগুলিকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার। কী সেই আকাbWা? কী সেই স্বপ্ন? চাষির সন্তান দেশের মুক্তি চেয়েছিল থেকে কী চেয়েছিল? তরুণীরা যখন অপমানিত, অত্যাচারিত, ধর্ষিতা হয়েছেন তখন তারা কীসের অপেক্ষা করেছেন? বেকার যুবক, ছাত্র ও নারীরা কী চেয়েছেন তাঁদের স্বপ্নের দেশ থেকে? লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগের পেছনে কোন্ আকাbWা ছিল, কোন্ স্বপ্ন ছিল? এর উত্তর খুঁজে বের করতে হবে, তাঁদের ঐ মুহূর্তগুলির কথা মনে রাখতে হবে। বারবার প্রশ্ন করে যেতে হবে।

স্বাধীনতার ৪০-তম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময় আমাদের দায়িত্ব হলো এইসব প্রশ্নগুলিকে তুলে ধরা, সেই সময়টাতে মনে করা, বর্তমানকে নতুন করে দেখা, এবং ১৯৭১-পরবর্তী সময়টাকে ফিরে দেখা। যে দেশের জন্য আমরা যুদ্ধ করেছি তার বাস্তব চেহারাটা পরীক্ষা করে দেখা। ১৯৭১ থেকে কতটুকু এগিয়েছি আমরা? টাকার হিসাবে মোট জাতীয় আয় গত চার দশকে বেড়েছে ১০০ গুণের বেশি। খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে ৩ গুণের বেশি— জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হারে। অর্থনীতি ১৯৭১ সালের তুলনায় বৃহৎ ও শক্তিশালী। প্রথমেই একটা সোজা অংকের কথা মনে আসে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ৭.৫ কোটি, এখন ১৫ কোটি। স্বাধীনতার ৪০ বছর পরে বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন কত জন? না, সে সংখ্যাটাও কিন্তু ৭.৫ কোটির কম নয়। শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যব্যবস্থা, নিরাপদ পানীয় জল, থাকার মতো (মোটামুটি ভালো বলছি না) বাসস্থান, সুরক্ষা বা মর্যাদার কথা এই দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণের সময় ধরা হয় না। দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণের সময় কেবল দেখা হয় জীবজন্তুর মতো বাঁচার বিষয়টি— প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস, যাতে না খেয়ে মরে না যায়। জন্তুর মতো বাঁচার এই দারিদ্র্যরেখার হিসাবেও ৭.৫ কোটি মানুষ ভুখা রয়েছেন, যাঁরা হয়তো অকালে মারাও যাবেন। ইউএনডিপি-র দারিদ্র্য সূচকের কথা যদি ধরি, তাহলে এদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষের সংখ্যা ১২ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। সংখ্যাটি বর্তমান জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ, ১৯৭১ সালের জনসংখ্যার চেয়ে ৭০ শতাংশ বেশি। তাহলে, কতদূর এগোলাম? কী উদ্‌যাপন করবো আমরা?

পর পর যেসব সরকার এসেছে তারা যে এই দারিদ্র্যের বিষয়ে কিছু করেনি এমনটা বলা যাবে না। কাজ তারা করেছে। এতদিন পর্যন্ত সব পরিকল্পনাতেই দারিদ্র্য দূরীকরণকে প্রধান কাজ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হয় নি। ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে সরকার নিজে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করা ছেড়ে দিয়ে বিশ্বব্যাংক-আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের নির্দেশে সেটা আরও ভালোভাবে করার জন্য নিয়ে এলো পিআরএসপি। সম্প্রতি সেটাও পরিত্যক্ত হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন বিশ্বব্যাংক-আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের কর্মীদের একটি সংস্থার ওপর।

গত দশকগুলিতে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞরা দারিদ্র্য সম্পর্কে গবেষণা করে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের অস্ত্র ও নিয়মাবলী বের করার জন্য ‘কঠোর পরিশ্রম’ করে অনেক পয়সা করেছেন। পরের পর সরকার দাবি করেছে যে তারা দারিদ্র্য দূরীকরণ খাতে বাজেটের বড় অংশ ব্যয় করেছে। এই বিরাট পরিমাণ টাকা দিয়ে

কী হলো? বাংলাদেশে যে সব বিশ্বখ্যাত দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি ব্যবহার করা হলো তারই বা ফল কী? আমাদের সমাজের চকচকে অংশটার মধ্যেই হয়তো এর উত্তর লুকিয়ে আছে।

হ্যাঁ, আমাদের দেশের চকচকে মুখটার কথা যেন ভুলে না যাই। ঐ মুখটার কিন্তু অনেক পরিবর্তন হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে সামাজিক সংগঠনে, আয় ও ভোগের ক্ষেত্রে। এখন আমাদের দেশে বিলিওনেয়ারের সংখ্যা ২৩ হাজারের বেশি, ১৯৭২ সালে সংখ্যাটি ছিল দুই বা তিন। খুব বড় বড় বাণিজ্য সংস্থাও এখন আমাদের অনেক। ঢাকা শহরে এখন যত বিলাসবহুল গাড়ি আছে বিশ্বের অনেক রাজধানীতেই তা নেই— এত গাড়ি যে লোকেরা চলতেই পারে না। মোবাইলের গ্রাহক সংখ্যা ৩ কোটি, তা আরও বাড়ছে। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় শপিং মল এ দেশে, আরও বড় একটি মল তৈরি হচ্ছে। উঁচু উঁচু অনেক বাড়ি রয়েছে, যেগুলি বুঝিয়ে দেয় যে নির্মাণ ব্যবসার রমরমা চলছে, অনেক লোকের হাতে অনেক টাকা, আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা আরো ভালো হচ্ছে। শহর বাড়ছে, গ্রাম থেকে লোক শহরে চলে আসছে। রাস্তা ও সড়ক পরিবহন দ্রুত বাড়ছে। এসবের প্রসাদ যারা পেয়েছে তারা এসব নিয়ে আনন্দ করতে পারে।

তার ওপর, বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে এনজিও ও ক্ষুদ্র ঋণে বিশ্বের মডেল। এ বিষয়ে এ দেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে, মানুষের নজর কেড়েছে। বাংলাদেশ নিজে বিভিন্ন রূপে বহুজাতিকদের ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আধিপত্যাধীন থাকলেও, এ দেশ থেকেও জন্ম নিয়েছে এক আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড— গ্রামীণ। এটি হলো ক্ষুদ্র ঋণের এক বিশেষ ব্যাংক, এখন এটি একটি আন্তর্জাতিক এনজিও। বিশ্বের সবচেয়ে বড় এনজিও-টি আমাদের দেশের। বিশ্বে ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ আমাদের ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থা। আর তা নিয়োজিত দারিদ্র্য দূরীকরণে। বিশ্বের নজর কেড়েছি আমরা, তা নিয়ে গর্বিত বোধ করতে পারি। কিন্তু তথ্য হলো, আমাদের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশই প্রয়োজনীয় খাদ্য কিনে খেতে পারেন না। আমাদের জনসংখ্যার ৮০ শতাংশই দারিদ্র্যসীমা পেরোতে পারেন না। গন্ডগোলটা কোথায়? কোথাও একটা বড়সড়ো গন্ডগোল তো আছেই।

সরকারিভাবে আমাদের দুটো ভূমি সংস্কার হয়েছে, ১৯৭২ সালে আর ১৯৮৪ সালে। কিন্তু জমি মালিকানা ও পরিচালন ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন হয় নি। তাতে অবশ্য বাণিজ্যিক কৃষি, উৎপাদনের যান্ত্রিকীকরণ, বাজারের জন্য উৎপাদন বা জমির দাম অসম্ভব বাড়া বন্ধ থাকে নি। নতুন প্রজন্মের ভূস্বামীরা সাধারণের জমি ও অন্যান্য সম্পদ হাতিয়ে আরও বড়ো হয়েছে।

স্বচ্ছল হওয়া, অতি-ধনী ১ শতাংশ তৈরি আর পাশাপাশি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠকে বঞ্চিত করা, প্রকৃতিকে ধ্বংস করা— এই ব্যাপারটা আরও খুঁটিয়ে দেখা দরকার। তাহলে গত চার দশক ধরে কোন্ উন্নয়ন চলছে তার চরিত্রটা বোঝা যাবে। এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। শুধু এই সম্পদের— সাদা ও কালো সম্পদের কিছু কিছু উৎস দেখিয়ে দেওয়া যায়। তার মধ্যে পড়ছে: সাধারণের সম্পদ (জমি, জঙ্গল, খালবিল, কারখানা, সংস্থা) হাতিয়ে নেওয়া, লুণ্ঠন করা; আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে কমিশন; রাষ্ট্রক্ষমতার সুযোগ নিয়ে বিশাল দুর্নীতি; শিশু ও নারী পাচার; ড্রাগ ও অস্ত্র পাচার; শেয়ার মার্কেটে নয়-ছয়; রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে শোধ না করা।

সাফল্য ও শিকার : কী উদ্‌যাপন করব?

গত ৪০ বছরে আমরা বিভিন্ন ধরনের সরকার পেয়েছি— নির্বাচিত সরকার, সামরিক সরকার, রাষ্ট্রপতি শাসন, সংসদীয় সরকার, আধা-সামরিক সরকার। নামগুলো আলাদা, তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি, কথাবার্তা, চলনবলন, দুর্নীতি ও নিপীড়নের মাত্রা, এগুলোও আলাদা। কিন্তু যে পার্টি আর যে ধরনের সরকারই ক্ষমতায় থাকুক, প্রধান প্রধান নীতির ক্ষেত্রে তারা একমুখী। তাদের উদ্দেশ্য এক, কাজকর্ম এক, একই রকম নির্ভরশীলতা, একই রকম নতি স্বীকার, একই ধরনের অগ্রাধিকার। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, মার্কিন দূতাবাস হলো সব সরকারেরই বন্ধু ও পথপ্রদর্শক। আর এরাই বিভিন্ন শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখে, ধারাবাহিকতা বজায় রাখে। এরা এমনভাবে নীতি নির্ধারণ করে যাতে করে লুণ্ঠন, শোষণ, সরকারি সম্পদের ও বেসরকারি বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ, বেসরকারি বাণিজ্যের সুবিধার জন্য সরকারি ব্যবস্থা তুলে দেওয়া, ভোগবাদের উত্থান— এসব কিছু মান্যতা পেয়ে যায়। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা, এগুলিকে একে একে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে, তুলে দেওয়া হয়েছে, যাতে করে বেসরকারি ক্ষেত্রের ব্যবসার সুবিধা হয়। ৮০-র দশকের শেষ থেকে হঠাৎ করে এসব ক্ষেত্রে বেসরকারি বাণিজ্যে রমরমা দেখা দেয়। কিন্তু তার ফলে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অত্যন্ত দামী জিনিস হয়ে পড়েছে। এ সব মিলে পুঁজি ও সম্পদ সঞ্চয়ের একটা আদিম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা সংখ্যায় ১ শতাংশের কম, কিন্তু ক্ষমতায় জোরদার। উন্নয়নের ধরন ও দেশের বর্তমান গতিমুখ উদ্‌যাপন করার অনেক কারণ আছে তাদের। তারা এদেশের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী ও পুরুষ, শ্রমিক ও কৃষক, ছিন্নমূল ও প্রান্তিক, ছাত্র, যুবা বা বৃদ্ধদের মধ্যে পড়ে না। সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে অবশ্য বর্তমান ধাঁচাটার বাইরে তাকানো ছাড়া পথ নেই। এটা ইতিহাসের শেষ নয়, তা হওয়া উচিতও নয়। এই বাংলাদেশের জন্য, দেশি-বিদেশি মুনাফা-সন্ধানীদের কাছে জীবন সঁপে দিতে, লুম্পেন ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের কাছে মাথা নুইয়ে থাকতে, মানুষ সর্বোচ্চ আত্মদান করে নি। পরাজিতের মনোভাব থেকে বেড়িয়ে আসা, মিথ্যা

এর পর ২৯ পৃষ্ঠায়

প্রবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পি-পি-পি মডেল : কার লাভ কার ক্ষতি ?

সিদ্ধার্থ গুপ্ত

সাড়ে তিন দশকের বামফ্রন্ট শাসনের অবসানে এই বছর মে মাসে তৃণমূল-কংগ্রেস জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যবাসীর স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ে পত্রপত্রিকায় (এবং অবশ্যই জনমানসে) তুমুল আলোড়ন চলছে। প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো মুখ্যমন্ত্রীর স্বয়ং স্বাস্থ্য দপ্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করা— যা এ রাজ্যে তো বটেই, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রেও সম্ভবত অভূতপূর্ব। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা হলেও এবং বহু ক্ষেত্রেই ঐ তিনটি বুনিয়াদী চাহিদার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলেও (রোগাক্রান্ত মানুষের চিকিৎসার ক্ষেত্রে) কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারগুলির অগ্রাধিকারের তালিকায় জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা অধিকাংশ সময়েই ''সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের সাথে''। স্মরণে আসছে, বোধহয় এক দশক আগে পর্যন্ত কেন্দ্রে স্বাস্থ্যদপ্তরের কোনো পূর্ণমন্ত্রী থাকতেন না। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উপাদান ঔষধ বা ভেষজ শিল্প আজও স্বাস্থ্যমন্ত্রকের বদলে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের অধীন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের কৌলীন্য যেটুকু ছিল, তা পরিবার কল্যাণ (বা সাদা বাংলায় বললে জন্ম নিয়ন্ত্রণ)-এর সৌজন্যে। এটা অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। যে স্বাস্থ্য খাতে জাতীয় বাজেট বরাদ্দ মাত্র ১.০২% , যা মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি) ৩%-ও ছুঁতে পারে না, সে বিষয়ে গুরুত্ব পড়বে কেন! ফলে স্বরাষ্ট্র, অর্থ, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি ভারী ভারী বিষয়ের মন্ত্রীত্ব ভাগ বাঁটোয়ারা হয়ে গেলে রেল, কৃষি, মানব-সম্পদেরও পরে ইত্যাদি প্রভৃতির তালিকায় স্বাস্থ্যের স্থান।

রাজ্যের ক্ষেত্রেও অবস্থাটা তথৈবচ। গত ৩৪ বছরের বাম জমানায় বহু বাগাড়ম্বর ও ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও রাজ্য বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ কখনোই ৫% ছাড়ায়নি। দিনে দিনে তা কমেছে এবং অধিকাংশ অর্থ খরচ হয়েছে কর্মচারীদের বেতন দিতে। বিদায়ী স্বাস্থ্যমন্ত্রী (বর্তমানে বিরোধী দলনেতা) স্বাস্থ্যদপ্তরে নিরবিচ্ছিন্নভাবে মনোযোগ দিতে পারেন নি, পঞ্চায়েত মন্ত্রকের বিপুল দায়িত্বও ঘাড়ে চেপে থাকায়। আর বাম জমানায় স্বাস্থ্য পরিষেবার হাল কী দাঁড়িয়েছিল সে বিষয়ে বিস্তারিত বলতে হলে আর এক অষ্টাদশপর্ব মহাভারত রচনা করতে হবে। এককথায় বলতে গেলে, একদিকে ত্রিস্তর সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্তর্জলি যাত্রা। আর অন্য দিকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং ঘুরপথে ভরতুকির মাধ্যমে বেসরকারি কর্পোরেট হাসপাতালের রমরমা ব্যবসা। একদিকে কলকাতা ও জেলা সদরের হাসপাতালগুলির চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের অমানবিক ব্যবহার— অন্যদিকে সেইসব হাসপাতালগুলির চূড়ান্ত অপদার্থতা ও ব্যর্থতার সুযোগে বেসরকারি নার্সিংহোম, রোগনির্ণয় কেন্দ্র প্রভৃতির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণহীন, নীতিহীন বাণিজ্য— মানুষের জীবন নিয়ে। এমন কোন দিন ছিল না যেদিন বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রের পাতা কখনও বিনাচিকিৎসায় শিশুমৃত্যু, কখনও হাসপাতালে প্রত্যাখ্যাত হয়ে রাস্তায় প্রসূতি মায়ের গর্ভমোচন, কখনও হাসপাতালের শয্যাতেই অচৈতন্য রোগীর আঙ্গুল ইঁদুরে খুবলে খাওয়ার খবরে সরগরম না হয়ে থাকত। চিকিৎসার উৎকর্ষের কারণে নয়, সম্পূর্ণ ভুল ও নঙার্থক কারণে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা সংবাদপত্র বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমের কেন্দ্রে জ্বলজ্বল করত। পাশাপাশি তথাকথিত ঝাঁ-চকচকে মেগা হাসপাতালগুলির পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি, রোগীর অসহায়ত্বের সুযোগে বিপুল 'বিল' করে আখমাড়াই কলের মতো রোগী শোষণ। চিকিৎসা সংক্রান্ত অবহেলা ও দুর্নীতির হাজার হাজার অভিযোগপত্রের উপর সরকারের দারুভূত মুরারীর মতো বসে থাকা এবং গোলযোগ তীব্র হলে মাঝে মধ্যে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ভারী ভারী তাত্ত্বিক বক্তব্য রাখার রাজ্যবাসী অভ্যস্ত হয়ে উঠে-ছিলেন। নানা ক্ষেত্রে বিপুল ব্যর্থতায় বামফ্রন্ট সরকারের কার্যকাল পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার ক্ষেত্রে অতলান্তিক অপদার্থতা বোধ করি সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়ে-ছিল— হ্যাঁ, সিঙ্গুর নন্দীগ্রামকে মাথায় রেখেই একথা বলছি।

নয়া উদ্যোগ—

ফলে নতুন মুখ্যমন্ত্রী মসনদে বসে যখন আরও আটটি দফতরের সঙ্গে স্বাস্থ্য মন্ত্রককেও নিজের হাতে রাখলেন, তখন তিনি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে ভুল করেননি বলেই মানুষের বিশ্বাস জন্মালো। শপথগ্রহণের মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই (২৪ মে) মুখ্যমন্ত্রী এসএসকেএম হাসপাতালে আচম্বিতে হাজির হলেন পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে। এরপর বাঙুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরোলজি, শম্ভুনাথ পন্ডিত, কলকাতা পুলিশ হাসপাতাল, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রভৃতিতে যাতায়াতের পথে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা, রোগীদের সঙ্গে কথা বলা এবং চিকিৎসক ও অচিকিৎসক কর্মচারীদের রোগী পরিষেবায় মনোযোগ দেবার নির্দেশ জনমানসে বিপুল প্রত্যাশা সৃষ্টি করল। এলাকার মানুষের বিরোধিতা সত্ত্বেও, বিগত সরকার যাদবপুর অঞ্চলে বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতালটিকে বেসরকারি সংস্থার কাছে বিক্রি করে দেবার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করে গেছিলেন। ঐ হাসপাতালে হাজির হয়ে মুখ্যমন্ত্রী চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, যন্ত্রপাতি সহ পরিকাঠামো দ্রুত উন্নত করা নির্দেশ

দিলেন। বাঙ্গুর হাসপাতালেও দ্বিতীয় এমআরআই যন্ত্রের জন্য অধীক্ষককে দ্রুত প্রস্তাব পেশ করতে বললেন এবং জানালেন যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় অর্থের কোনো অভাব হবে না। ৩০শে জুন থেকে বি সি রায় শিশু হাসপাতালে মাত্র ৩৬ ঘন্টার মধ্যে ১৯টি শিশুর মৃত্যু হল। স্বাস্থ্য অধিকর্তা নিয়োজিত তদন্ত কমিটি দ্রুত অনুসন্ধান চালিয়ে রিপোর্ট পেশ করলেন যে এতে হাসপাতালের বা চিকিৎসকদের কোনো গাফিলতি নেই। দূরদূরান্ত থেকে অত্যন্ত অসুস্থ এবং কম ওজনের শিশুদের নির্বিচারে কলকাতায় 'রেফার' করাই জন্য দায়ী। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং সেই রিপোর্ট সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারি ভাষ্য হিসাবে তুলে ধরলেন। ঘোষণা করলেন জেলাস্তরে শিশুচিকিৎসার জন্য এক ঘনসংবদ্ধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সারা রাজ্যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার দ্রুত উন্নতির লক্ষ্যে এক বিশাল কর্মকাণ্ড ঘোষণা করলেন। এর মধ্যে পড়ছে দ্রুত চিকিৎসক ও অচিকিৎসক কর্মচারীদের প্রচুর শূন্যপদ পূরণ করার জন্য রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে বাদ দিয়ে একটি নতুন আয়োগ প্রতিষ্ঠা করা; কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য হাসপাতালগুলিতে 'চাপ' কমাবার জন্য এবং অপ্রয়োজনীয় 'রেফারেল' বন্ধ করার জন্য গ্রাম, মহকুমা ও জেলাস্তরের হাসপাতালগুলিতে ঢেলে সাজানো; চিকিৎসক, অন্যান্য কর্মী ও যন্ত্রপাতি সহ পরিকাঠামো উন্নতি করা; জেলা হাসপাতালগুলিতে হৃদরোগ, স্নায়ুরোগ, স্নায়ুসংক্রান্ত অস্ত্রোপচার (Neurosurgery), দুর্ঘটনার দ্রুত চিকিৎসা (Trauma care unit)-এ সমস্ত বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা— যাতে গ্রামের মানুষকে ঘটিবাটি বিক্রি করে কলকাতায় ছুটে আসতে না হয়। এছাড়াও মহকুমা স্তরের প্রতিটি হাসপাতালে আইসিইউ, আইটিইউ, বার্ন ইউনিট এবং ব্লাড ব্যাঙ্ক খোলার প্রতিশ্রুতি রইল। জটিল রোগের সব পরীক্ষানিরীক্ষা (সিটি স্ক্যান, এমআরআই সহ) জেলাতেই হবে। প্রতিটি জেলায় একটি করে (পূর্বতন প্রতিশ্রুতি মোতাবেক) না হলেও আগামী চার বছরে আরও দশটি মেডিক্যাল কলেজ গড়ে তোলা হবে চিকিৎসকের অভাব পূরণ করতে। তামিলনাড়ু মডেলে আরও সাতটি স্বাস্থ্য জেলা (Health Districts) গড়ে তোলার প্রস্তাবও উঠল। পাহাড়, সুন্দরবন ও জঙ্গলমহলের মতো প্রান্তিক ও অতিদরিদ্র এলাকার জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য প্যাকেজ। ২০১১-২০১৫ সালের মধ্যে অ্যাকশন প্ল্যানের মধ্যে আরও যে যে বিষয় আছে তা হল—

সকলের জন্য হেলথ কার্ড

প্রতি ৬ কিমির মধ্যে ২৪ ঘন্টার জন্য মায়েদের প্রসব পরিষেবা এবং ২৫ কিমির মধ্যে (বাসস্থান থেকে) অস্ত্রোপচার ('সিজার') পদ্ধতির পরিকাঠামো নির্মাণ।

প্রতিটি জেলা হাসপাতালে 'সিক নিউবর্ন ইউনিট' চালু করা।

ব্লক স্তর পর্যন্ত পুরুলিয়া মডেলে সদ্যোজাতদের চিকিৎসা চালু করা।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী রাজ্যে কয়েকশো নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ। জঙ্গলমহল, সুন্দরবন, চা বাগান, বনবস্তি ও খনি এলাকা মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট চালু করা।

সদ্য পাশ করা ডাক্তারদের ১ বছরের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে রাজ্যের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পাঠানো।

স্বাস্থ্যকর্মী ও নার্সদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর বদলি ও দুর্গম এলাকায় অন্তত তিনবছর থাকা বাধ্যতামূলক করা।

ব্লকস্তরের হাসপাতালে ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, হৃদরোগ, স্ট্রোক ও ক্যানসারের চিকিৎসা চালু করা।

সরকারি হাসপাতাল থেকে বিনামূল্যে অথবা ভরতুকি দিয়ে ঔষধ দেওয়া। রোগীর পথ্যের মান বজায় রাখা। সরকারি হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দেওয়া।

এই কর্মসূচি স্বাগত। পশ্চিমবাংলাবাসী তো এমনই এক সর্বজনীন সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার স্বপ্ন দেখেন। ইংরাজিতে বললে বলতে হয় "Too good to believe"। আরও প্রতিশ্রুতি, এই সবই করা হবে খুবই দ্রুতবেগে। কোনোটি দুবছরে, কোনোটি সর্বাধিক পাঁচ বছরে। একথা অনস্বীকার্য যে গত ৩৪ বছরে বামফ্রন্ট এইসব অত্যন্ত উচিত কাজের প্রায় কিছুই করেনি। যার ফলে আজ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় পৌনে দুকোটি শিশুর জন্য একটিই রেফারেল হাসপাতাল, ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট বি সি রায় শিশু হাসপাতাল। নয় কোটিরও বেশী জনসংখ্যা বিশিষ্ট একটা রাজ্যে 'সিক নিউবর্ন ইউনিট' (SNCU)-র সংখ্যা মাত্র সাতটি। ২০০৩ সালে পুরুলিয়ায় দেবেন মাহাত জেলা সদর হাসপাতালে প্রথম ইউনিটটি খোলার ফলে জেলায় শিশুমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, যা আজ সারা দেশে 'পুরুলিয়া মডেল' নামে খ্যাত। কিন্তু তারপরও আটবছরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাম শাসনে আর মাত্র ছ'টি এসএনসিইউ প্রতিষ্ঠিত হয়— সিউড়ি, (বীরভূম), ইসলামপুর (উত্তর দিনাজপুর), বাঁকুড়া সদর, কোচবিহার সদর, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) ও কলকাতার বি সি রায় হাসপাতাল। অথচ ২০১০-১১ সালের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিবছর জন্ম হয় প্রায় ১১ লক্ষ শিশুর। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের খাতে ৩২টি এমন ইউনিট খোলার অর্থ বরাদ্দ থাকলেও তা করতে বিগত সরকার ব্যর্থ হয়েছিলেন। গত পাঁচ বছরে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের (NRHM) ৬৬৮ কোটি টাকা রাজ্য খরচ করতে না পারায় ফিরে গেছে। বর্তমানে রাজ্যে লাগাতার শিশুমৃত্যুর প্রেক্ষিতে তথ্যগুলি সম্ভবত অপ্রাসঙ্গিক নয়।

যে কথা বলছিলাম, নতুন সরকার জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ব্যবস্থাকে 'ঢেলে সাজাবার লক্ষ্যে' যে কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন, সমস্ত শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষই তাকে দুহাত তুলে স্বাগত জানাবেন। কিন্তু নীতি নির্ধারণের পর আসে তা প্রয়োগের বিষয়। যে প্রশ্নটা প্রথমেই মনে আসে তা হলো, এই কর্মকান্ডের জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথা থেকে আসবে?

বিশেষত দু লক্ষ কোটি টাকারও বেশি দেনাগ্রস্ত (এ নিয়ে অবশ্য প্রাক্তন ও বর্তমান অর্থমন্ত্রীর 'হাভার্ড বনাম ইয়েল' তরজা চলছেই) একটা রাজ্যের পক্ষে? ঐ সমস্যারও সমাধান আছে ঘোষিত কর্মসূচিতে। তা হলো—

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে, বিশেষত তৃতীয়স্তরের বিশেষজ্ঞ পরিষেবার ক্ষেত্রে (Tertiary Speciality Medical Care) বেসরকারি কর্পোরেট হাসপাতালগুলির সহযোগিতা গ্রহণ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (P- P- P) মডেল গ্রহণ।

আমরা ঘরপোড়া গরু। সিঁদুরে মেঘ দেখলে আতঙ্ক জাগে। ঝুলির মার্জারের উঁকিঝুঁকিতে মনে পড়ে যায় বাম জমানায় কর্পোরেট স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ীদের দাপাদাপি, মনে পড়ে যায় 'হেলথ সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ-১' (HSID Phase I)-র কথা, যার পোষাকি নাম, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস (SAP)— যা ছিল বিশ্বব্যাঙ্কের ৭০১ কোটি টাকা ঋণের আবশ্যিক শর্ত। পরবর্তীকালেও ডিএফআইডি(DFID) বা কেএফডব্লু (KFW)-র মত বিদেশি ঋণদাতা সংস্থাগুলির নির্দেশে স্বাস্থ্যপরিষেবার সর্বস্তরে উন্নততর পরিষেবার অজুহাতে পিপিপি-র নামে ব্যাপক বেসরকারিকরণ করা হয়। রোগীদের খাবার, নিরাপত্তা, ধোবিখানা, সাফাই সবকিছুই বাইরের বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে দেওয়া (Outsourcing), ঠিকাদারদের সাহায্যে BOT মডেল (Build-Operate-Transfer) চালু করা। সর্বস্তরে Users' Fee চালু করে ক্রমে সমস্ত নিঃশুল্ক ব্যবস্থাটাকেই বাতিল করে দেওয়া।

এত দ্রুত কীভাবে ভুলব যে বিগত সরকার পিপিপি-র নামে প্রায় ২৫০টিরও বেশি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের (ব্লক থেকে জেলাস্তর পর্যন্ত) এক্স-রে, প্যাথলজি, সোনোগ্রাফি, খাদ্য সরবরাহ প্রভৃতি টেন্ডার ডেকে তুলে দিয়েছিল বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির হাতে। সাতটি মেডিক্যাল কলেজে সিটি স্ক্যান, ডায়ালিসিস ইত্যাদি ছাড়াও ২৩টি এইডস্ নির্ণয় ও পরামর্শদান কেন্দ্র, কলকাতা পুরসভার বহু ক্লিনিক ও প্রসূতিসদনও তুলে দেওয়া হয় রঙবেরঙএর বেসরকারি সংস্থার হাতে। পিপিপি-র নামে যেসব হাসপাতালগুলি বিগত সরকার বেচে দেয় তার তালিকাও দীর্ঘ। যাদবপুরের কে এস রায় যক্ষা হাসপাতাল (বর্তমান এএমআরআই), ধুবুলিয়া-হরিণঘাটা ও ডিগরির যক্ষ্মা হাসপাতাল, স্ট্র্যান্ড রোডের মেয়ো হাসপাতাল ইত্যাদি।

বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাদের কার্যকালে ক'বার সরকারি হাসপাতালে পদার্পণ করেছেন বলা কঠিন। কিন্তু ফিতে কেটে হাসি হাসি মুখে বেসরকারি কর্পোরেট 'সেবাসদনে'র উদ্বোধন তাদের প্রায় নিয়মিত কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেসব হাসপাতালের জমি প্রায় বিনাপয়সায় সরকারেরই দেওয়া— ১০% গরীব মানুষের 'নিঃশুল্ক' চিকিৎসা করা হবে এই অজুহাতে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-নয়াচর-হরিপুরের গণআন্দোলনের পথে হেঁটে পরিবর্তনের যে সরকার ক্ষমতায় এসেছেন, তার কাছে মানুষের এটাও প্রত্যাশা যে বিগত সরকারের মতো তারা পশ্চিমবঙ্গকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হতে দেবেন না। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নততর পরিষেবা দেবার লক্ষ্যে সরকারের ঘোষিত কর্মসূচি সাধু। কিন্তু সেজন্য যে পথ প্রাথমিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে— সেই পিপিপি মডেল, স্বাস্থ্য-ব্যবসায়ীদের সাথে সহযোগিতা বা সহযোগিতার নামে সরকারি সম্পদ ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাটাই তাদের হাতে তুলে দেওয়ার পন্থা, শেষঅবধি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পশ্চিমবাংলাবাসীর স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াবে। প্রায় দুমাস আগেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত (আনন্দবাজার পত্রিকা) দুটি খবর তুলে দিচ্ছি।

১। "কলকাতায় সরকারি তিন হাসপাতালকে চাঙ্গা করতেও পি পি পি"

—এতে বলা হয় ভবানীপুরের রামরিখ দাস, পাইকপাড়ার ইন্দিরা মাতৃসদন ও চিৎপুরের নর্থ সাবারবার্ন হাসপাতালকে পিপিপি মডেলে দরপত্র ডেকে হস্তান্তর করা হবে বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবসায়ীদের। হাসপাতাল থেকে যত রোজগার হবে তার অধিকাংশ (?) নেবে ঐ সংস্থা, বাকিটা জমা পড়বে সরকারি তহবিলে। সাংবাদিক প্রশ্ন করেন— "বেসরকারি হাতে গেলে গরিবেরা নিখরচায় সেখানে পরিষেবা পাবেন তো?" স্বাস্থ্যকর্তাদের উত্তর— "বেসরকারি হাতে যাবার পরও যাতে বেশ কিছু গরীবের বিনা পয়সায় চিকিৎসা হয়, তা দেখা হবে। বস্তুত আয়ের বেশিরভাগই বেসরকারি সংস্থাকে ছেড়ে দেবার বিনিময়ে প্রতি মাসে কয়েকজন গরীব রোগীকে সরকার ওখানে নিখরচায় চিকিৎসার জন্য পাঠাবে। হাসপাতালের আয়ের যে অংশ সরকারি অ্যাকাউন্টে আসবে, সেখান থেকেই ওঁদের চিকিৎসার খরচ মেটানো হবে। বাকিদের জন্য সরকার খরচ বেঁধে দেবেন।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এ মডেল নতুন কিছু নয়। এই একই সমস্ত যুক্তি দেখিয়ে নিরাময়-কে হস্তান্তর করা হয়েছিল। "কিছু গরীব রোগীর চিকিৎসা"র যুক্তি এই ধরনের তথাকথিত পিপিপি মডেলের ভিত্তি। আসলে এ হলো বেনামে জনগণের সম্পত্তিকে বিক্রি করে দেওয়া। সরকারি পরিষেবার সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে একটি অন্তবর্তী (Transitional) পদক্ষেপ হল এই পিপিপি।

২। "জেলায় যৌথ উদ্যোগ হাসপাতাল।"

বিষয়টি কী? সরকার স্থির করেছেন গ্রামবাংলার মানুষকে যাতে আর কলকাতায় দৌড়াতে না-হয়, সেজন্য রাজ্যসরকার প্রতিটি জেলায় 'সরকারি-বেসরকারি অংশীদারি' (পি-পি-পি) প্রকল্প অনুযায়ী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তুলতে উৎসাহ দেবে বেসরকারি নানা সংস্থাকে। জেলা হাসপাতালের অব্যবহৃত জমিতে রাজ্যসরকার পাঁচ-ছয়তলা বাড়ি গড়ে দেবেন যাতে ঐ সব কর্পোরেট সংস্থা রোগনির্ণয় ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার কেন্দ্র স্থাপন করবে।

পরবর্তীকালে আর এন টেগোর হাসপাতালের অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী জানালেন যে ঐ গোষ্ঠীর কর্ণধার ডাঃ শেঠীর সঙ্গে রাজ্য সরকারের একটি চুক্তি হয়েছে। সেই মোতাবেক শিলিগুড়ি ও বোলপুর সহ ছটি জেলায় সরকারি হাসপাতালের চত্বরেই ঐ ধরনের স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে উঠবে।''

এই লেখা যখন লিখছি তখন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ঘোষিত হল যে, আগামী দুবছরেই ১৫টি জেলায় এই ধরনের ''সুপারস্পেশালিটি সেন্টার'' গড়া হবে বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির সহায়তায়। অর্থাৎ রাজ্য সরকারের তরফে গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত করার এইটিই হল পন্থা। গ্রামের ও জেলার স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো ও উন্নত করার লক্ষ্যে এই হলো সর্বরোগহর বিশল্যকরণী।

আরও সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য পরিষেবা নিগমের প্রধান শ্রী পুনিত যাদব স্বাস্থ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.wbhealth.gov.in) একটি নথি পেশ করেছেন যার নাম "Concept paper cum suggestion solicitation paper for Healthcare Infrastructure built up in PPP model for Tertiany Health Care Hospitals in West Bengal Districts & Sub Divisions"। আগ্রহী পাঠকেরা নথিটি দেখতে পারেন। ঐ নথিকে একদিকে পিপিপি মডেলে যারা হাসপাতাল গড়তে চান তাদের কাছে প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে— এ বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করার জন্য। নথিটির বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ এই প্রবন্ধে নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি সমস্ত কিছুই তো মহাভারতের যুদ্ধের প্রাক্কালে গীতায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনকে দেওয়া ভাষ্যের মতই 'পূর্ব-নির্ধারিত'। নীতিও গৃহীত হয়ে গেছে, চুক্তিও (মৌখিক বা লিখিত) হয়ে গেছে। এখন 'জনগণের' মতামতটা আলঙ্কারিক মাত্র।

পিপিপি-র ইতিহাস

একথাটা ঋদ্ধ পাঠকদের জানা আছে যে ১৯৭৮ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনিসেফ আয়োজিত 'আলমা আটা' সম্মেলনে ১৩৪টি দেশের অংশগ্রহণে গৃহীত হয় ''২০০০ সালে মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্য'' নীতি। সেই নীতি সফল করার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবাকেই পন্থা হিসাবে গ্রহণ করে ভারত সহ সমস্ত সদস্য দেশগুলি। এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা হতে হবে সর্বজনীন, সুসংবদ্ধ, আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে, সমতার ভিত্তিতে ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ছাড়াও খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, নিরাপদ পানীয় জল, নিকাশী ব্যবস্থা, মা ও শিশুর পরিচর্যা, পরিবার পরিকল্পনা, টিকাদান, সংক্রামক মহামারীর নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ অসুখ ও আঘাতের চিকিৎসা, জীবনদায়ী ঔষধের সরবরাহ প্রভৃতি সবই ছিল প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার মধ্যে।

আলমা আটা ঘোষণায় প্রতিফলিত হয়েছিল সামাজিক ন্যায় ও সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারা, যা পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী দেশগুলির, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং আন্তর্জাতিক ঋণদাতা সংস্থাগুলির (বিশ্বব্যাঙ্ক, আইএমএফ, ফোর্ড ফাউন্ডেশন, ডিএফআইডি প্রভৃতি) ঘোর না-পসন্দ্। এরা প্রথম থেকেই আলমা আটার প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার ধারণাকে তীব্র আক্রমণ করতে থাকেন। বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে পরিবর্তন, সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর পতন, পূর্ব ইউরোপ থেকে সমাজতন্ত্রের অপসারণ প্রকৃতির ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও আমূল নীতি পরিবর্তন ঘটল। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা 'অনীক'-এর সম্পাদকের অনুমোদন ক্রমে বারান্তরে করা যাবে। শুধু অতি সংক্ষেপে বলি, দেশে দেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্তর্বস্তুকে বাদ দিয়ে, তাকে ব্যবহার করল খরচ কমাবার ও জনগণকে প্রতারণা করায় এক মাধ্যম হিসাবে। বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলিও ক্রমাগত তৃতীয় বিশ্বের সরকারগুলিকে চাপ দিত খরচ কমাবার জন্য, স্বাস্থ্য ক্ষেত্র থেকে হাত গুটিয়ে নেবার জন্য। এখন 'একমেরু বিশ্বে' দেশে দেশে চালু হল কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস— অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রের মতো স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও। ভারতেও এই পরিবর্তন এল ১৯৯২-৯৩ সালে রাও-সিংহ জুটির তথাকথিত নয়া অর্থনীতির ও উদারনীতির হাত ধরে।

১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক পেশ করল— ''বিশ্ব উন্নয়ন রিপোর্ট'' (World Development Report), যাতে সুপারিশ করা হয়েছে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ কমিয়ে জনস্বাস্থ্যকে 'বাজারের হাতে' ছেড়ে দিতে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পুনর্বিন্যাসের কেন্দ্রে চলে এল বেসরকারি পুঁজির প্রবেশ। সরকারের দ্বারা বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানানো, উপভোক্তাদের থেকে খরচ উশুল করে নেওয়া, রোগীদের খদ্দের বা ক্লায়েন্ট নামে উল্লেখ, বেসরকারি স্বাস্থ্যবীমা। এবং? এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ, যার মূল উদ্দেশ্য "Socialisation of Investment but Privatisation of Profit"। সোজা কথায় 'পাবলিকের' সম্পদে 'প্রাইভেট' মুনাফা। সর্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা, সাম্যের কথা, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার কথা বুদবুদের মতো শূন্যে মিলিয়ে গেল। তাই 'সকলের জন্য স্বাস্থ্য' আর 'পিপিপি' সম্পূর্ণ বিপরীত দুই প্রক্রিয়া। এ দুয়ের সমন্বয়সাধন আসলে সোনার পাথরবাটিতে করে ঘোড়ার ডিমের অমলেট খাবার মতই কষ্ট-কল্পনা।

পিপিপি মডেলের মূল কথা হল সমস্ত পরিষেবার মূল্য চুকিয়ে দিতে হবে বেসরকারি পরিষেবাদাতাদের। সম্প্রতি যোজনা কমিশন বলেছেন যে, শহরে দৈনিক ৩২ টাকায় ও গ্রামে ২৬ টাকায় মানুষ দিন কাটাতে পারেন। সরকারি মতে দারিদ্র্যসীমা হলো শহরে দৈনিক ২১০০ ক্যালরি ও গ্রামে ২৪০০ ক্যালরি খাদ্যশস্যের দাম। ঐ দারিদ্র্যসীমার নীচে যারা আছেন, তাদের চিকিৎসার কিছু কিছু ব্যয় হয়ত সরকার মিটিয়ে

দেবেন। কিন্তু তথাকথিত ঐ সীমার উপরের দরিদ্র মানুষদের — যাদের দৈনিক আয় গ্রামে ২৬ টাকার একটু বেশি বা শহরে দিনে ৩২ টাকার বেশি, তাঁদের কী হবে? কী হবে মধ্যবিত্তদের — চিকিৎসার ব্যয়বৃদ্ধির এই সাংঘাতিক প্রবণতার সময়ে? ১৯৮৭ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক 'Financing Health Services in Developing Countries : An agenda for reform" নামক রিপোর্ট প্রথম Users' Fee-এর প্রস্তাব করে যা আজ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধরনের পিপিপি মডেল বা ইউজার্স ফী প্রথম চালু হয় আফ্রিকার নানা দেশে। এবং তার ফলাফল হয় বিপর্যয়কর। দেখা যায়, যেখানে যেখানে এই মডেল চালু হয়েছে সেখানে সেখানে টাকা দিতে না পারায় গরিব রোগীদের আসা কমে গেছে। বিশেষত, মহিলা, শিশু এবং বৃদ্ধদের মধ্যে অসুস্থতার ও মৃত্যুহার ঊর্ধগামী হয়েছে।

ভারতবর্ষেও অন্ধ্রপ্রদেশে ২০০১ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে এই মডেল চালু হওয়ার পর বিভিন্ন হাসপাতালে গরীব মানুষদের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি, অস্ত্রোপচার, প্রসব এবং রোগনির্ণয়ের জন্য আসা কমে গেছে। বিশেষত, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তপসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষেরা। ২০০১-'০২-তে মহারাষ্ট্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। (User charges in India's Health Sector : An assessment, by A Mahal and N Veerabhadraiah, in *The National Commission on Macro-economics & Health*; 2005)

এমনিতেই সারা বিশ্বের মধ্যে রোগীদের ব্যক্তিগত খরচের ক্ষেত্রে (যাকে out of the pocket expenditure বলা হয়) ভারতবর্ষের স্থান একেবারে উপরের দিতে। সমস্ত খরচের ৮৩ শতাংশ আসে রোগীর পকেট বা গেঁজ থেকে। সরকার দেন মাত্র ১৭ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অনুপাতটা আরও বেশি, ৯১ শতাংশ বনাম ৯ শতাংশ। এই পরিস্থিতিতে গ্রাম এবং জেলাস্তরে কর্পোরেট হাসপাতালের হাত ধরে পিপিপি মডেলে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন আদৌ গ্রামের গরীব মানুষকে সাহায্য করবে কী? গ্রামীণ উচ্চবিত্তরা উপকৃত হতে পারেন, তাঁদের কলকাতায় ছুটে আসতে না হলে। কিন্তু তাঁদের জন্য জেলাসদরে এখনই অনেক বেসরকারি ব্যবস্থা রয়েছে। মূলত সমাজের যে অংশ সরকারি হাসপাতালে যান, এই ধরনের বেসরকারি পরিষেবায় তাঁদের কী লাভ হবে? তাঁরা তো মূল্যও চোকাতে পারবেন না। জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের দলিলে বলা হয়েছে হাসপাতালে ভর্তি হবার খরচ মেটাতে একজন ভারতবাসীর গড় বার্ষিক আয়ের ৫৮ শতাংশ খরচ হয়ে যায় এবং ৪০ শতাংশ ভারতবাসীকে সর্বস্বান্ত হতে হয়। কেবল চিকিৎসার ব্যয় মেটাতে প্রতি বছর ১ কোটি দেশবাসী দারিদ্রসীমার নীচে নেমে যান। পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলার (বাঁকুড়া, মালদহ ও দঃ ২৪ পরগণা) তিন হাজারেরও বেশি পরিবারে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, প্রায় ৭১% চিরদরিদ্র পরিবার, ৫১% আংশিক ঘাটতি যুক্ত পরিবার ও ৪৫% স্বচ্ছল পরিবার চিকিৎসার ব্যয় মেটাতে গিয়ে বিপর্যয়ের মধ্যে (catastrophic shock) পড়েছেন ও তলিয়ে গেছেন। খাদ্য ছাড়া সারা বছর সমস্ত খরচের ৪০%-এর বেশি যদি অসুখ-বিসুখের পিছনে খরচ হয় তাকে বলে বিপর্যয়কারী অভিঘাত। ফলে জমি বাড়ি গহনা বিক্রি হয়ে গেছে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে হয়েছে, হাল বলদ বন্ধকী পড়েছে, বিয়ে বা সামাজিক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে, উচ্ছেদ হতে হয়েছে ভিটে থেকে এবং বহুক্ষেত্রেই চিকিৎসার ব্যয় মেটাতে না পেরে রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ('Demand and willingnes to pay for healthcare in rural West Bengal', by S.Majumdar and M. Guruswamy, *Social Change*, December 2009)

গরীবদের চিহ্নিত করা এবং চিকিৎসার খরচে 'ছাড় দেবা'র (waiver) নীতি প্রায় কোথাও সফল হয়নি। এ বিষয়ে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে সমীক্ষার বহু রিপোর্ট আছে। গরীব মানুষেরা প্রায়ই এই ছাড়ের কথা জানেন না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা প্রভাবশালী মানুষেরা দখল করে নেয়। এ বিষয়ে আগ্রহী পাঠকেরা ড. বিজয়া রায় ও বর্তমান প্রবন্ধকারের প্রতিবেদন "Public-Private Partnership and User Fees in Healthcare : audience from West Bengal" (*EPW*, September 17-23, 2011, pp 74-78) পড়ে দেখতে পারেন।।

উপসংহার

বহু মানুষের আত্মদান, সংগ্রাম, প্রত্যাশায় বর্তমান সরকার আসীন হয়েছেন। এই সরকারের জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। গত ৩৪ বছরের অচলায়তন ভেঙ্গে এগোনো এবং রাজ্যের প্রকৃত উন্নতির লক্ষে তাদের সদিচ্ছাকেও পশ্চিমবঙ্গবাসী সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু রাজ্যবাসীর দায়িত্বও রয়েছে সরকারকে সঠিক পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করার, সুপরামর্শ জোগানোর— যেন তা পরশুরামের রামরাজ্য গল্পের 'গোণর্ধ' দেশে পরিণত না হয়। ধিক্কৃত সিপিএম জমানার অনুসৃত নীতির পুনঃপ্রয়োগ তাই আমাদের বিচলিত করে— বিশেষত যেসব নীতি জনবিরোধী বলে প্রমাণিত হয়েই গেছে। মনে রাখতে হবে, সরকার নতুন কিন্তু আমলাকুল প্রায় অপরিবর্তিত। সুযোগসন্ধানী বণিকশ্রেণী সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের প্রাথমিক ধাক্কা সামলিয়ে আবার উপযুক্ত অবস্থা খুঁজছে। বিগত সরকারকে ঘিরে থাকা নানা ধরনের স্বার্থান্বেষী ও দুর্নীতিপরায়ণ মানুষেরা স্বাভাবিক নিয়মেই এই সরকারকেও ঘিরতে চাইবে, ক্ষমতার কেন্দ্রের পাশে মক্ষিকার মত সমবেত হবে, সরকারকে জনবিরোধী পরামর্শ দিয়ে ভুল পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করবে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এই পি-পি-পি মডেল যে প্রকৃত অর্থে সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিরোধী, অতীতের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে তা আমাদের সোচ্চারে বলতেই হবে। "নান্যহ পন্থা"— এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই।

প্রবন্ধ

গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের সংগঠক ও কর্মীদের জন্য কয়েকটি জরুরি কথা

কাত্যায়নী

পশ্চিমবঙ্গের মানবাধিকার আন্দোলন এই মুহূর্তে এক যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছে। গত চার দশকের ধারাবাহিক অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মানবাধিকারের দাবিটি আজ এই রাজ্যে পৌঁছে গেছে গ্রামে গ্রামে— রচিত হয়েছে এক উজ্জ্বল ঐতিহ্য। আবার সম্প্রতিকালে একদিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার হাতছানি ও আন্দোলনকে করায়ত্ত করার হীন প্রচেষ্টা, অন্যদিকে জনমত গঠন ও আন্দোলনের পথ ছেড়ে সরকার বা-দল-নির্ভরতার কানাগলি— এই দ্বিবিধ অশুভ প্রক্রিয়ার পরিণতিতে আন্দোলনে জন্ম নিয়েছে নানা সংশয় ও বিভ্রান্তি এবং ফলত হতাশা। এই পটভূমিকায় সমস্ত ধরনের বিচ্যুতিকে পর্যুদস্ত করে আন্দোলন যাতে সঠিক অবস্থানে অবিচল থাকতে পারে— সেই উদ্দেশ্যে ভারতের মতো তৃতীয় দুনিয়ার একটি দেশের পটভূমিকায় মানবাধিকার আন্দোলনের দিশা প্রসঙ্গে দু'টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। উল্লেখ্য যে, জুলাই '১১-তে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত এক মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে উত্তরপ্রদেশের তরুণ রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনের কর্মীদের পক্ষ থেকে বর্তমান প্রবন্ধটি (অনুবাদ) এবং পশ্চিমবঙ্গের এক মানবাধিকার কর্মীর পরবর্তী প্রবন্ধটি পঠিত হয়েছিল। —*সম্পাদকমণ্ডলী, অনীক*।

সংখ্যার প্রাচুর্য্যই যদি পরিমাপ হয়, সেক্ষেত্রে এটা দেখে কেউ সন্তোষ প্রকাশ করতেই পারেন যে, এই মুহূর্তে দেশ জুড়ে দু'ডজনেরও বেশি সংস্থা নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার সংক্রান্ত দাবিদাওয়া নিয়ে সরব রয়েছে। এটাও সত্যি যে, ভারতের নানা প্রান্তে নিয়ত ঘটতে থাকা পুলিশী দমন-পীড়ন, রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন, জাতিগত ও লিঙ্গবৈষম্য জনিত উৎপীড়ন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও গণহত্যায় হিন্দুত্ববাদী শক্তি ও প্রশাসনের ভূমিকা, বন্ডেড লেবার ও শিশু-শ্রমিক সংক্রান্ত সমস্যা, দেশজুড়ে সব ধরনের শ্রমিকদের ক্রমাগত বিভিন্ন প্রকার ন্যায্য ও আইনসঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা এবং সর্বোপরি কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে অর্ধশতাব্দীর চেয়েও বেশি সময় ধরে বজায় থাকা অর্ধ-শতাব্দী প্রাচীন আধা-ফ্যাসিস্ট সৈন্যশাসন— এসব নিয়েও এখনও পর্যন্ত যে পরিমাণ প্রবন্ধ ও রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে, দেশের বিভিন্ন হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে যে পরিমাণে পিটিশন দাখিল করা হচ্ছে, সংখ্যার বিচারে তা কম নয়। কিন্তু সংখ্যাগত চাকচিক্যের বাইরে বেরিয়ে এসে আমরা যদি প্রকৃত ব্যালান্সশীটে চোখ রেখে বুঝতে চেষ্টা করি যে, বিগত ৩০-৩৫ বছরে গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনগুলি এদেশের শাসনব্যবস্থা, সমাজ ও সংস্কৃতিকে কতখানি প্রভাবিত করতে পেরেছে, কিংবা ব্যাপক জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার চেতনাকে উন্নত করে সেই অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্নে জনগণকে কতখানি জাগরুক ও সক্রিয় করতে পেরেছে, ব্যাপক সামাজিক ভিত্তি স্থাপন করে তাকে কতখানি ব্যাপক গণআন্দোলনের রূপ দিতে পেরেছে, সেক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্টই হতাশ হতে হয়।

কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী বা নির্দিষ্ট পেশাহীন সাধারণ মানুষ একমাত্র তখনই গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের অস্তিত্ব টের পান যখন তাঁদের এলাকায় কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার কর্মীদের দল তদন্তের জন্যে পৌঁছায়। এরা এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের রাজধানী বা বড় শহর থেকে আসা কিছু ভালো মানুষ রূপে কল্পনা করেন যারা ওঁদের অধিকারগুলি নিয়ে আওয়াজ ওঠান বা নানান কালাকানুন ও সরকারি দমন-পীড়নের প্রতিবাদ করেন। আর শিক্ষিত ও আংশিক সচেতন মধ্যবিত্তেরা গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনকে দেখেন রিপোর্ট ছাপা, পিটিশন দাখিল করা, তদন্তকারী দল পাঠানো, সই সংগ্রহ অভিযান চালানো আর দাবিপত্র প্রস্তুত করা কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির আন্দোলন রূপে। আবার ক্ষমতাসীন অন্ধ রাষ্ট্রবাদী ও হিন্দুত্ববাদী বিচারধারায় প্রভাবিত মধ্যবিত্তদের চোখে এই গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলন হলো নিতান্তই তথাকথিত ''বামপন্থী'' সন্ত্রাসবাদ, ইসলামিক মৌলবাদী সন্ত্রাসবাদ বা জম্মু-কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্বের তথাকথিত ''রাষ্ট্রদ্রোহী'' বিচ্ছিন্নতাবাদীদের রক্ষাকবচ।

এমন কিছু গণতান্ত্রিক অধিকার সংগঠনও আছে যারা অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসরে কোনো বাম সংগঠনের ফ্রন্ট সংগঠনের ভূমিকা পালন করে এবং যাদের কাছে এই আন্দোলন নিতান্তই কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সংগঠনের ওপর সরকারের দমনপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেই সীমিত থেকে যায়।

এই যে গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনের পরিসর রাজনৈতিক আন্দোলনের দমননীতির বিরুদ্ধে, বন্দীমুক্তির দাবীতে এবং দানবীয় আইন জারির বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ থাকে এটা গোষ্ঠীতন্ত্রের ঝোঁক বই আর কিছু নয়। এগুলো নিশ্চয় জরুরী, কিন্তু গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনের কর্তব্য শুধুমাত্র এইসব কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। বিষয়টা কেবল সংগ্রাম ও প্রতিরোধের রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্ন নয়, বরং জনগণের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন। জনগণের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারের সমস্ত বিষয়গুলি এখনও পর্যন্ত বিক্ষোভ ও প্রচারের ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা হয় না। যতদিন পর্যন্ত না জনগণকে এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতন এবং

এইগুলোর ভিত্তিতে সমবেত করা না যাচ্ছে, ততদিন গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন শহুরে বুদ্ধিজীবিদের আন্দোলন থেকে যাবে, যেখানে কেবল ভ্রমণ, রিপোর্ট প্রকাশ, স্মারকলিপি প্রদান, স্বাক্ষর সংগ্রহ এবং আবেদন- নিবেদন, এই সব কাজই হয়।

যাই হোক, সমস্যাটা আসলে কোথায়? সম্ভবত, গণতান্ত্রিক অধিকারকে আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে বিচার করা হয় না অথবা এ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নেই অথবা সাময়িক, গোষ্ঠি উপযোগী এবং প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে আমেরিকা, ফ্রান্স এবং ইওরোপের আরও কয়েকটি দেশে নাগরিক অধিকারের আন্দোলন বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে কালো মানুষদের আন্দোলন, পুরুষতন্ত্রে বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত মহিলাদের নারীবাদী আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন— যুদ্ধ-বিরোধি আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং প্রতিবাদী গায়ক-শিল্পীদের আন্দোলন ইত্যাদি মিশ্র আন্দোলনে ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে এক দারুণ মাত্রায় পৌঁছেছিল। অর্থনৈতিক সঙ্কটের রাজনৈতিক সঙ্কটে রূপান্তর এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পরিসর সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে পশ্চিমে এই সময়টা ছিল ব্যাপক মোহভঙ্গের পর্ব। একই সঙ্গে, সেটা ছিল এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকায় তীব্র মুক্তি আন্দোলনের উত্তাল ঢেউয়ের পর্ব, যা পশ্চিমের দেশগুলির জনগণের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পশ্চিমি রাষ্ট্রযন্ত্র পরবর্তী কালে কী ভাবে এই বিক্ষোভকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল এবং এই আন্দোলন কী ভাবে শক্তি হারিয়েছিল, সে অন্য কাহিনী। কিন্তু এটা ঐতিহাসিক সত্য, পশ্চিমের নাগরিক অধিকারের আন্দোলন প্রকৃতই ছিল এক ঝড়ো গণ-আন্দোলন ।

চীন বিপ্লবের সময়কালে সান ইয়াৎ সেন-এর স্ত্রী মাদাম সুং চিং লিঙ-এর নেতৃত্বে সিভিল রাইট লিগ চীনের শহরের জনতার মধ্যে ভালো ভিত্তি স্থাপন করেছিল। পরিস্থিতি তখন সেখানে এমনই ছিল যে কুয়োমিনতাং শাসনের স্বেচ্ছাচারী চরিত্র চীনের জনতার সামনে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং এমতাবস্থায় দায়িত্ব ছিল এই সত্যটিকে প্রতিষ্ঠিত করা যে শুধুমাত্র জনগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাতেই মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করতে পারেন। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কোনো ধোঁয়াশা ছিল না সেখানে।

ভারতবর্ষে নাগরিক বা গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের পটভূমি ছিল একেবারে আলাদা। ১৯৭০-র দশকে, বিশেষ করে 'জরুরি অবস্থা'-র অভিজ্ঞতা, ভারতে গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনকে একটি অপরিহার্য প্রয়োজন রূপে উপস্থিত করে, তাতে বিশেষ শক্তি ও বেগের সঞ্চার করে। তার পরবর্তী দশকগুলিতে নাগরিক অধিকার আন্দোলন ব্যস্ত থেকেছে দমনমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে ও রাজনৈতিক বিরোধীদের উপর নিপীড়নের বিষয়ে তদন্ত রিপোর্ট, দাবিপত্র, পিটিশন, ধর্না ও বিক্ষোভের মতো আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদে। প্রয়োজনের (pragmatism) হাত ধরে যার জন্ম হয়েছিল তা রুটিন কাজকর্ম, নিয়মতান্ত্রিকতা ও প্রতীকী কার্যকলাপের সংকীর্ণ পরিধিতে তা আটকে পড়ে। এ কারণে আমাদের দৃঢ় ও পরিষ্কার বিশ্বাস যে, ভারতীয় গণতন্ত্রের পরিকাঠামো সামাজিক অবস্থা ও নয়া-উদারবাদী অর্থনীতির বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে আজ গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনকে নতুন চিন্তার ভিত্তিতে নতুন করে স্থাপন করতে হবে। এই সম্পর্কে আমাদের কিছু চিন্তাভাবনা এখানে উপস্থাপিত করছি।

১) গণতান্ত্রিক এবং নাগরিক অধিকার সম্পর্কিত আন্দোলনগুলিকে শহুরে বুদ্ধিজীবীদের সংকীর্ণ বৃত্ত ও রুটিনবদ্ধ মেমোরান্ডাম-পিটিশন পেশ করার ছকে বাঁধা পদ্ধতি থেকে বের করে এনে ব্যাপক জনতার (এখানে ব্যাপক জনতা বলতে শহর-গ্রামের কর্মরত মেহনতি মানুষের কথাই বলা হচ্ছে) কাছে নিয়ে যেতে হবে। একে একটি ব্যাপক গণআন্দোলনের আকার দিতে হবে। একথা বলাই বাহুল্য যে শিক্ষিত ও স্বচ্ছল মানুষদের চেয়ে মেহনতি মানুষদের অনেক বেশি মাত্রায় গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের শিকার হতে হয়। ভারতীয় সংবিধানে যে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের উল্লেখ আছে, তার সুবিধা নেওয়ার ক্ষমতাও এদেশের মধ্যবিত্ত ও অভিজাত শ্রেণীই ভোগ করে (ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কোনো এনজিও-র করা জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতে গরিব মেহনতি মানুষেরাও কদাচিৎ ছিটেফোঁটা সুযোগ-সুবিধা পেয়ে যান— তবে সেটা নেহাতই বিচ্ছিন্ন ঘটনা তথা ব্যতিক্রম মাত্র, যা আসলে রূঢ় বাস্তবটাকেই আরো স্পষ্ট করে জাহির করে)। সংবিধান, এদেশের মেহনতি মানুষকে যেটুকু সুবিধা দেওয়ার বন্দোবস্ত করে রেখেছে, সেটুকুও মামলা-মোকদ্দমার জটিল প্যাঁচে আদালতের চক্কর কাটতে কাটতে মরীচিকায় পরিণত হয়। আর যদি বা আদালত থেকে সামান্য কিছু সুবিচার লাভ হয় সেটাও সরকারি অফিসবাবু আর থানায় দারোগাদের পকেট ভরতে ভরতে বা স্তূপীকৃত ফাইলের তলায় সমাধিস্থ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনগুলির এই মুহূর্তে যেটা অবশ্য করণীয়, তা হল বিপুল জনসমষ্টিকে নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারগুচ্ছ সম্পর্কে শিক্ষিত, সচেতন ও সংগঠিত করে তোলা। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে লাগাতার প্রচার ও বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে হবে।

২) সাধারণ মানুষকে রাষ্ট্রের পরিকাঠামো ও কার্যবিধি সম্পর্কে যথাযথভাবে শিক্ষিত করার মাধ্যমেই তাঁদের বোঝানো সম্ভব যে ভারতীয় সংবিধানে সোচ্চারে ঘোষিত নাগরিক স্বাধীনতা ও অন্যান্য মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি বাস্তবে কতটা অন্তঃসারশুন্য। ভারতের শিক্ষিত নাগরিকদেরও সামান্য অংশই আজ এই ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে পরিচিত যে ভারতীয়

গণতন্ত্রের পথনির্দেশিকা যে সংবিধান, সেটি তৈরি করেছিল যে সংবিধান পরিষদ, তা সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে, অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, নির্বাচিত হয়নি। অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধান ও তার রচনাপদ্ধতি বুনিয়াদগতভাবে কখনই গণতান্ত্রিক নয়। তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে যে কেউ সহজেই বুঝতে পারবেন যে আমাদের সংবিধান আসলে ঔপনিবেশিক শাসনকালে প্রণীত ভারত শাসন আইন (১৯৩৫)-এরই এক সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ মাত্র। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে জওহরলাল নেহরু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, স্বাধীনতার পর সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটের ভিত্তিতে এক সম্পূর্ণ নতুন সংবিধান সভা নির্বাচিত করা হবে। এই প্রতিশ্রুতির কী হলো, সে প্রশ্ন কি আমরা করতে পারি না? এটাও লক্ষণীয় যে, সংবিধান যেটুকু নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান করে, প্রয়োজনে সেটাও ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থাও (সংবিধান সংশোধন দ্বারা) আছে ঐ সংবিধানেই। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে ভারতের আইন ব্যবস্থা, যা ঔপনিবেশিক কাল থেকে একই থেকে গেছে, তা এদেশের সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক অধিকারগুলিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় করে দেয়। যদি বা এই আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে সামান্য কিছু অর্জনও করা যায়, সেটুকুও পুরোপুরি হারিয়ে যায় দুর্নীতিপ্রবণ ও অপদার্থ আমলাতন্ত্র এবং তৎসহ স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী পুলিশি দমনপীড়নের মাধ্যমে। ভারতের দরিদ্র জনগণ একেবারে মৌলিক নাগরিক সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রতি পদে পদে বিভিন্ন সরকারি অফিসের আধিকারিক ও কর্মচারীদের ঘুষ দিতে বাধ্য হন। পুলিশ, ঠগ-বাটপারের মতো প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের লুঠ করে আর গুণ্ডাদের মতো পেটায়। জেলখানার অভ্যন্তরে কয়েদিদের পশুর মতো থাকতে বাধ্য করা হয়। এছাড়া থানায় আটক অবস্থায় মৃত্যু এবং রাস্তায় সাজানো এনকাউন্টার আজকাল হরদম চলছে। বিচারাধীন বহু কয়েদির জীবন জেলের ভেতরেই কেটে যায়, বিনা বিচারে। ৩ কোটি কেস আজ বিচারের অপেক্ষায় দিন গুণছে। নিম্নতর বিচারালয়গুলি পুলিশের চেয়ে কিছু কম দুর্নীতিপ্রবণ নয়। পাশাপাশি দুর্নীতির ঘুনপোকা আজ সমাজের উচ্চস্তরেও ছড়িয়ে পড়েছে। নির্বাচনী পার্টির নেতারা বেশিরভাগই হয় নিজেরাই দালাল, গুণ্ডা বা অপরাধী, তা না হলে তাদেরকে পালন ক'রে ভোটব্যাঙ্কের খেলা খেলে ও কালো টাকায় নিজেদের ঘর বোঝাই করে। এই সব প্রশ্ন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এগুলি সবই ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। এর সংযোগ আসলে এক বিরাট, অত্যাচারী রাষ্ট্রকাঠামোর সঙ্গে, যা জনগণের মূল নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সংবিধান কর্তৃক প্রতিশ্রুতিকে একটি নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য অবয়বে পরিণত করে। এমতাবস্থায়, এটা কি গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের একটা মূল ও একেবারে অপরিহার্য দায়িত্ব নয় যে তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের এই স্বেচ্ছাচারী চরিত্র, তার পরিকাঠামো ও কার্যপদ্ধতির প্রসঙ্গে ব্যাপক জনসমুদায়কে শিক্ষিত ক'রে জনতাকে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ করার একটা কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করবে? আমাদের বিচারে এটা ব্যাপক গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনেরই কর্তব্য যে, তারা সার্বিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নতুন সংবিধান সভার নির্বাচন ও একটি বাস্তব গণতান্ত্রিক সংবিধান গঠনের দাবি করবে, ঔপনিবেশিক আইন ব্যবস্থা, পুলিশ প্রশাসন, জেল ম্যানুয়াল ও আমলাতন্ত্রের পুনর্গঠনের দাবি করবে, অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত সংসদীয় ও সরকারি ব্যবস্থার পুনর্গঠন করে নেতা ও আমলাদের জন্য সরল, মিতব্যয়ী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহি-সম্ভব এক জীবন সুনিশ্চিত করে। তবে প্রশ্ন শুধু আইনব্যবস্থার ঔপনিবেশিক পরিকাঠামো বদলানোরই নয়। স্বাধীন ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে, একের পর এক স্বৈরাচারী কালা কানুন বানানোর লম্বা ইতিহাস আছে। এই ধরনের বেশ কিছু আইন আজও বর্তমান, যার মধ্যে ছত্তিশগড় বিশেষ জনসুরক্ষা আইন এখন সবচেয়ে কুখ্যাত। এই সমস্ত কালা কানুন বাতিলের দাবিতে ব্যাপক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। এটা হলো জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির সঙ্গে জড়িত একটা মূল প্রসঙ্গ, যাকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনকে একটা ব্যাপক জন আন্দোলনের রূপ দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

৩) কারুর মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে এই পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের কার্যকলাপ একটি সুদূরগামী বিপ্লবের কর্মসূচিতে পরিণত হয়ে যাবে ও এর পরিধি হয়ে উঠবে অতি বিস্তৃত ও রাজনৈতিক। এক্ষেত্রে আমরা বলব যে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলির প্রসঙ্গ নিজেই একটি বড়ো রাজনৈতিক প্রশ্ন যাকে আজ প্রায়শই সংকীর্ণ ও সংকুচিত করে দেওয়া হচ্ছে। আরেকটি প্রশ্ন হলো, কারো কারোর এই ধারণা থাকতে পারে যে, যেহেতু ভারতের (বা অন্য কোনো দেশের) বুর্জোয়া ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে নিজের পরিকাঠামোগত পুনর্গঠন করতে বা জনতাকে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রদান করতে অক্ষম তাই এই দাবি, গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের কর্মসূচিকে সামাজিক বিপ্লবের কর্মসূচিতে পরিণত করে দেবে। কিন্তু সাধারণ জনতা থেকে বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত, জনগণের বড়ো অংশই এখনও অতটা 'র‍্যাডিক্যাল' ও 'বিপ্লবী' হয়ে ওঠেনি। উপরোক্ত সমস্ত দাবীকে কেন্দ্র করে এরা হয়তো ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু এটা ওদের কাছে মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর হবে যে, সম্পূর্ণ সামাজিক অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে বৈপ্লবিক পদ্ধতিতে না বদলালে জনগণের বাস্তবিক গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করা নিতান্তই অসম্ভব। ব্যাপক জনগণের এই অংশ বর্তমান ব্যবস্থাতেই গণতান্ত্রিক আর নাগরিক স্বাধীনতা পাওয়ার আশা নিয়ে এই

গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনে সামিল হবে এবং নিঃসন্দেহেই এটা তাঁদের অধিকারও বটে। যদি বর্তমান ব্যবস্থা ওদের বাস্তব গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে সক্ষম না হয় তাহলে তার আসল চরিত্র এই অংশের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং এরই সাথে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য তাদের সংগ্রাম এক সুদূরগামী বিপ্লবের কর্মসূচির অংশে পরিণত হবে। সংক্ষেপে, একটি গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের ঘোষণাপত্র কখনই একটি সামাজিক বিপ্লবের ঘোষণাপত্রের মতো হতে পারে না। ব্যাপক জনতার ওপর সামাজিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য ওপর থেকে কখনও চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে না। এর পরিধি সেই সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতার দাবিতেই সীমিত থেকে যাবে, 'স্বাধীনতা-সমতা-ভ্রাতৃত্ব' এই স্লোগান সহকারে যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নবজাগরণের দার্শনিক ও গণতন্ত্রের সাবেকি তাত্ত্বিকরা, যাকে পৃথিবীর সমগ্র বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সংবিধানগুলি অন্তত কাগজে-কলমে স্বীকার করে নিয়েছে (বা অন্তত অস্বীকার করে না)। এই অধিকারগুলির জন্যে সংগ্রামরত সংগঠিত জনশক্তি রাষ্ট্রক্ষমতার ওপর চাপ দিয়ে সামান্য কিছু গণতান্ত্রিক স্পেস ও নাগরিক স্বাধীনতা অর্জন করে নেবে এবং এইভাবে নিজেদের ঐক্যবদ্ধতার শক্তিকে অনুভব করতে পারবে। সংগঠিত সংগ্রামের ভিত্তিতে প্রাপ্ত এই গণতান্ত্রিক 'স্পেস' ও উন্নত গণতান্ত্রিক চেতনার ভিত্তিতে তারা আবার উচ্চতর স্তরে মৌলিক অধিকারের জন্য সংগ্রামে সংগঠিত হয়। আর, এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তারা যদি তাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই ব্যবস্থার সীমা ও অক্ষমতা দেখতে ও বুঝতে শুরু করে এবং তার বাঁধন ভাঙতে এগিয়ে যায়, তা হবে এই জনতার নিজস্ব, স্বাধীন বিচার। কিন্তু যদি কোনও গণতান্ত্রিক অধিকার সংগঠন প্রথমেই একথা ঘোষণা করে দেয় যে, যেহেতু বুর্জোয়া গণতন্ত্র সাধারণ মানুষকে সত্যিকারের গণতন্ত্র দিতে পারবে না সেহেতু গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রামের অর্থ হলো সমাজ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম, তাহলে তা হবে নিতান্তই সংকীর্ণতাবাদিতা, জনতার বর্তমান চেতনা বিকাশের আগেই চাপিয়ে দেওয়া; আর এর ফলে বুর্জোয়া আইনি সংগ্রাম থেকে শিক্ষা লাভের সম্ভাবনাও উপেক্ষিত হবে। এ ধরনের প্রবণতা গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের সংযুক্ত মঞ্চের জায়গাটাকে ক্রমাগত সংকুচিত করবে, সেটা হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

৪) বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনকে অন্যায়ভাবে দমন করার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো ও রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এগুলির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যারা এই প্রচলিত ব্যবস্থায় বিশ্বাস করেন না এবং এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলন সংগঠন করেন (ব্যাপক জনতার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই হোক হোক অথবা 'বামপন্থী' সন্ত্রাসবাদ হোক) তাঁদের খুনি, অপরাধী বা সমাজবিরোধী আখ্যা দেওয়া যায় না। তাঁদেরও সাংবিধানিক ও আইনগত সুবিধা পাওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে। সাজানো এনকাউন্টারে তাঁদের মেরে ফেলা যায় না, কিংবা মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে অত্যাচার করাও যায় না। এমনকি সুপ্রিম কোর্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছে যে, যাঁরা সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাস করেন, এ বিষয়ে কথা বলেন, নিষিদ্ধ সংগঠনের সাহিত্য যাঁদের সংগ্রহে থাকে, এমনকি যাঁরা নিষিদ্ধ সংগঠনের সদস্য তাঁদের বিরুদ্ধেও অকারণে সন্ত্রাসবাদিতা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা যাবে না। শুধুমাত্র যাঁরা সরাসরি কোনও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত অথবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে যুক্ত একমাত্র সেসব ক্ষেত্রেই এই অভিযোগগুলি দায়ের করা যাবে। এমনকি এসমস্ত ক্ষেত্রেও মাথায় রাখা উচিত যে, যাঁরা রাজনৈতিক আদর্শ বা দায়বদ্ধতার কারণে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে লিপ্ত হন তাঁরাও অপরাধী নন। তাঁদের সাথে মতাদর্শগতভাবে বা কার্যপদ্ধতির ক্ষেত্রে বিরোধ থাকলেও এটা আমাদের মানতেই হবে। অপরাধমূলক আইনের ধারায় অভিযুক্ত করার বদলে তাঁদের যুদ্ধবন্দী হিসেবে দেখা উচিত এবং এই সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন মেনে চলা কর্তব্য। রাষ্ট্রদ্রোহিতার ঔপনিবেশিক আইনের (ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ নং ধারা) অ-গণতান্ত্রিক চরিত্র নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। এই ধারার সম্পূর্ণ বিলুপ্তিই হবে আমাদের দাবি। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনকারীদের গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এটিও স্পষ্ট করে দেওয়া উচিত যে, যখন কোন নিরপরাধ সাধারণ মানুষ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের শিকার হন বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনে লিপ্ত কোনও দল যদি প্রতিবাদ জানানোর পদ্ধতি হিসেবে রাষ্ট্রের কোনও অপহৃত বা বন্দী আধিকারিককে হত্যা করে (যুদ্ধকালীন অবস্থায় কাউকে হত্যা করা অবশ্য অন্য কথা) তবে গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন অবশ্যই জোরালোভাবে তার বিরোধিতা করবে। কিন্তু যদি গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যায় তবে দেখা যাবে যে প্রধান দিকটি হলো, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকারের লড়াই বস্তুত জনসাধারণেরই বিরুদ্ধে সরকারের সন্ত্রাসবাদী লড়াই। তথ্য থেকে অনায়াসেই বোঝা যায় যে, ছত্তীশগড়ে মুখ্য বিষয়টি কখনই মাওবাদী প্রতিরোধ গুঁড়িয়ে দেওয়া নয়, বরং বিদেশি এবং দেশি পুঁজিবাদী সংস্থাগুলিকে স্থানীয় সম্পদ লুঠতরাজ করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে আদিবাসীদের অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করা। মাওবাদী প্রতিরোধেরও পথ করে দিয়েছে এটিই। সালওয়া জুদুম, কোয়া কমান্ডো প্রভৃতি নাম দিয়ে মুষ্টিমেয় কিছু সশস্ত্র মানুষকে জনসাধারণের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা নিয়ে এমনকি সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্যও জনসাধারণের বিরুদ্ধে সরকারের যুদ্ধের কথাটিকেই সমর্থন

করে। এর আগেও 'সালওয়া জুড়ুম'-এর জন্য রাজ্যের কিছু বড় বড় 'কর্পোরেট হাউস'-এর কাছ থেকে টাকা নেওয়ার ব্যাপারটি দিনের আলোয় এসেছে। বর্তমানে সরকার পরবর্তী রক্তক্ষয়ী কাজের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। নারায়ণপুর জেলার হেডকোয়ার্টারের কাছে মাদ অঞ্চলে রমণ সিংহ সরকার ৭৫০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা বরাদ্দ করেছে যেখানে আসাম ও বিহার থেকে আগত একটি করে ব্যাটেলিয়ান বিদ্রোহ দমন ও জঙ্গল-যুদ্ধে প্রশিক্ষণ নেবে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, কাশ্মীর আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পর সেনাবাহিনী এখন দেশের অন্যতম দরিদ্র অঞ্চলের নিপীড়িত অধিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ভবিষ্যতে বস্তার জেলাতেও 'সেনাবাহিনীর' (বিশেষ ক্ষমতা) আইন লাগু হলেও আশ্চর্যের কিছু থাকবে হবে না। তা না হলেও অবশ্য সেনাবাহিনী যথেচ্ছ অঘোষিত যুদ্ধ চালাতে পারে যার বলি হবে কেবল মাওবাদীরাই নয়, স্থানীয় আদিবাসীরাও। ছত্তীশগড় থেকে লালগড় পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াইয়ের ছদ্মবেশে চলা জনসাধারণের বিরুদ্ধে লড়াই বহুদিন থেকেই একটি জ্বলন্ত বিষয়। আগামী দিনে এর বিস্তার ও গুরুত্ব বেড়েই যাবে। এখানে আমরা এর ওপর জোর দিতে চাইছি যে, এই গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনকে যদি জোরালো ও সংগঠিত, দীর্ঘ, প্রলম্বিত প্রচার ও আন্দোলনের মাধ্যমে একটি ব্যাপক গণ আন্দোলনের রূপ না দেওয়া যায়, যদি মুষ্টিমেয় আলোকপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবীদের বদ্ধ গণ্ডী থেকে মুক্ত করে এর সামাজিক ভিত্তির প্রসার না ঘটানো যায় তবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলতে থাকা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে মানুষের সামনে আনা সম্ভব হবে না। একটি ব্যাপক গণপ্রতিরোধ তৈরি করা সম্ভব হবে না। যদিও গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনকারীদের তৈরি রিপোর্ট-এর খসড়া বিক্ষিপ্তভাবে এখানে সেখানে প্রকাশিত হয়েছে তবুও জনসংখ্যার সিংহভাগ এখনও পর্যন্ত মূল ধারার গণমাধ্যম কর্তৃক প্রচারিত তথ্যই বিশ্বাস করে। এই প্রসঙ্গে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, রাজনৈতিক আন্দোলন দমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সরকার-বিরোধী ও রাজনৈতিক বন্দীদের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নটিকে তুলে ধরা এবং মিথ্যা মামলা, মিথ্যা এনকাউন্টার, বন্দীদের ওপর অত্যাচার এবং কালাকানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাটা যদিও গণতান্ত্রিক অধিকার সংগঠনের প্রাথমিক ও মুখ্য কর্তব্য, কিন্তু তাদের কার্যক্ষেত্রকে শুধু এই সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ করে রাখাটা ভুল হবে। যেসব ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংগঠন এই ব্যবস্থার বাইরে থেকে ও ভিতর থেকে জনগণের অধিকারের জন্য লড়াই করেন তাদের ওপর সব ধরনের নিপীড়ন ও অত্যাচার প্রতিরোধ করার পাশাপাশি গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনকে নাগরিক মুক্তি ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনকে তাদের লড়াইয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। কেবলমাত্র তখনই তা একটি ব্যাপক গণ আন্দোলনের আকার নেবে। কিন্তু আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন এখনও সেটি করে উঠতে পারে নি। তার ফলে এটি মুষ্টিমেয় শিক্ষিত রাজনৈতিকভাবে সচেতন শহুরে বুদ্ধিজীবীদের স্তিমিত আন্দোলন হয়েই থেকে গেছে। যে আন্দোলনের কাজকর্ম কেবলমাত্র তদন্তকারী দল পাঠানো, রিপোর্ট তৈরি করা, পিটিশন দেওয়া, বিবৃতি দেওয়া, মেমোরান্ডা দেওয়া এবং নিয়মমাফিক ধর্না-র মধ্যে আবদ্ধ।

৫) এখানে আরও একটি প্রাসঙ্গিক কথা উল্লেখ করতেই হয় এবং তা বিশেষ মনোযোগও দাবি করে। এটি একটি রূঢ় সত্য, যা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না। সেদিন আমি শ্রমিক আন্দোলনের এক সক্রিয় কর্মীর সাথে কথা বলছিলাম। তাঁর মতে, শহর থেকে আগত আন্দোলনের শিক্ষিত ও সমাজের উঁচু-বর্গের সমর্থক ও সমব্যথীদের গ্রেপ্তার ও তাদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সোচ্চার প্রতিবাদ ও রাগের বহিঃপ্রকাশ হয়, অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর কর্মী ও সমর্থকদের গ্রেপ্তার ও তাদের ওপর অত্যাচার নিয়ে সেরকমটা দেখা যায় না। একইভাবে, উচ্ছেদ ও নিঃস্বকরণের পরিপ্রেক্ষিতে যখন গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে আলোচনা হয় তখন জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ নিয়ে যথেষ্ট সমবেদনার সঙ্গে সোচ্চার প্রতিবাদ করা হয়, কিন্তু ভাগচাষি, কৃষিমজুর ও অন্যান্য গ্রামীণ সর্বহারা, যাদের কর্মসংস্থান বিপন্ন হচ্ছে, তাদের কণ্ঠস্বর উপেক্ষিত হয়। সন্দেহ নেই যে মূলস্রোতের গণমাধ্যম ও নির্বাচনী রাজনীতির ব্যবসায়ীরা এর পিছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এও খতিয়ে দেখতে হবে এই আন্দোলনটি নির্জীব র‍্যাডিকালিজম-এর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকাতে এতে শ্রেণীগত একপেশেমি দেখা দিয়েছে কিনা।

৬) গত দুই দশক ধরে গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের যতটুকু শক্তি, কার্যকারিতা বেঁচে আছে তাও ক্রমাগত বিনষ্ট ও নিম্নগামী হয়েছে। এই ক্রমাগত পতনশীলতার কারণ হিসাবে ভারতবর্ষের উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক বিশ্বাসঘাতকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের মূল ভিত্তি শহরের মধ্যবিত্তদের র‍্যাডিক্যাল গণতান্ত্রিক অংশের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে গেছে। (এদের মধ্যে পড়েন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, আইনজীবী, গণমাধ্যমের ব্যক্তিত্ব ও কিছু অন্যান্য স্বনির্ভর পেশাজীবী)। গত দুই দশকে শহরের মধ্যবিত্তদের একটা বড়ো অংশ গত দুই দশকের দ্রুত পুঁজিবাদী উন্নয়ন থেকে যথেষ্ট সুবিধা ভোগ করেছে; এদের সম্মান বেড়েছে, জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়েছে। সাধারণ মানুষ যারা মোট জনসংখ্যার ৭৭.৫%, যারা ২০ টাকায় দিন চালায়, তাদের থেকে এই শ্রেণীর দূরত্ব বেড়েই চলেছে। এরা এখন সংখ্যালঘু সুবিধাবাদী, ভোগবাদী গোষ্ঠীর অংশ, এদের গণতান্ত্রিক অধিকার চলতি আর্থসামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা

মোটামুটি সংরক্ষিত। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজের সময় ইত্যাদি আন্দোলন সম্বন্ধে এই শ্রেণীর বিন্দুমাত্র সমবেদনা নেই। ভারতের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এই শ্রেণীটি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের সংগ্রামে জনগণের পাশে থেকে লড়াইয়ের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছে এবং নিজেদের অংশ গ্রহণের কথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে। খুব বেশি হলে এই শ্রেণীর উৎসাহ এনজিও-গুলির সংস্কারমূলক কাজকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নাগরিক স্বাধীনতা ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতেও এদের অবস্থান নির্জীব ও রুটিন ধরনের। খুব স্বল্প সংখ্যক উচ্চমধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষই অধিকার আন্দোলনে সত্যিকার চিন্তা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এমতাবস্থায় যদি এই আন্দোলনকে একটি সংগ্রামশীল ব্যাপক গণআন্দোলনের রূপ দিতে হয় তবে আমাদের নির্ভর করতে হবে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত র‍্যাডিক্যাল নতুন প্রজন্মের ওপর। নয়া-উদারবাদের বর্তমান যুগে যে নিম্নমধ্যবিত্তদের মেহনতি জনগণের মতোই অনিশ্চয়তা ও অসুরক্ষিত একটি কোণে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, তাদের মেহনতি মানুষের মতো জীবনযাপন করতে বাধ্য করা হয়েছে। শহর ও গ্রামের জনগণের মতোই এদের কাছে নাগরিক স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের বিষয়গুলি জ্বলন্ত এবং জীবন্ত। একটি ব্যাপক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের সংগঠন গড়ার প্রক্রিয়া যত এগিয়ে যাবে, ততই এমনকি মেহনতি জনগণের মধ্য থেকেও বুদ্ধিজীবী তৈরি হয়ে তারা নেতৃত্বে উঠে আসবেন।

৭) পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের তত্ত্ব এবং প্রয়োগ শুরু হয় পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই। লগ্নি পুঁজির আধিপত্য বাড়তে থাকার (সাম্রাজ্যবাদের শতাব্দী, বিংশ শতাব্দীতে) সাথে সাথে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পরিধি সংকুচিত হয়ে আসে, নানা রূপে একনায়কতন্ত্র দেখা দেয়। সবচাইতে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধি হিসাবে দেখা দেয় ফ্যাসিবাদ। আজও সারা বিশ্বে বিভিন্ন রূপে ফ্যাসিস্ট ব্যক্তিরা ও ফ্যাসিস্ট ধরন বর্তমান রয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে (যেটি কিনা দ্বিতীয় পুঁজিবাদের যুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে) পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদী বা প্রায়-ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারী শাসনের মধ্যেকার সীমারেখাটি প্রায়শ মুছে যায়। ভারতের পূর্বতন রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরামন একবার স্বীকারই করেছিলেন যে, নয়া উদারনৈতিক অর্থনীতি বাধাহীনভাবে প্রয়োগ করতে গেলে একনায়কতন্ত্র প্রয়োজন। কথাটা খুব পরিষ্কার। গত দু দশক ধরে চলা নয়া উদারনীতির আমলে গণতন্ত্রের অপরিসর জায়গাটুকুও দ্রুত সংকুচিত হয়ে পড়ছে। সরকার যাবতীয় সামাজিক দায়িত্ব থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে এবং বাজারের শক্তি দ্বারা চালিত সমাজজীবনে মানুষ তার একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। বড়ো সংখ্যায় কর্মী ছাঁটাই করা হচ্ছে, বেকারি বাড়ছে, শ্রম আইন অবান্তর হয়ে পড়ছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বেসরকারীকরণের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মানুষকে কোনও পরিবর্ত জীবনধারণের সুযোগ না দিয়েই জমি থেকে, বসতি থেকে, উচ্ছেদ করা হচ্ছে। আজ হোক, কাল হোক, এগুলি একসময় একটি সামাজিক বিস্ফোরণের জন্ম দেবে। তাকে দমন করতে রাষ্ট্রযন্ত্রকে অবশ্যই নগ্ন স্বৈরতান্ত্রিক নিপীড়নকারী রূপ ধারণ করতে হবে। এই প্রক্রিয়াকে প্রতিরোধ করতে হলে গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনকে বৃহত্তর গণমঞ্চে সংগঠিত করতে হবে, উচ্ছেদ হওয়া সব মানুষকে, ক্ষুব্ধ সব মানুষকে নিয়ে একত্রিত ও ব্যাপক আন্দোলনে সংগঠিত করতে হবে।

৮) গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্ন কখনই রাষ্ট্রযন্ত্রের সাথে যুক্ত নয়, বরং তা সামাজিক কাঠামোর সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ভারতীয় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যাপারটিকে দেখা যাক। আমরা বাস করি একটি ঔপনিবেশিক-উত্তর কৃষিপ্রধান সমাজে, যেখানে নবজাগরণ-আলোকপ্রাপ্তি-বিপ্লব সম্বলিত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুঁজিবাদী সম্পর্ক বিবর্তিত হয়নি। দুশ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন এবং তৎপরবর্তী অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ধীর গতিতে পুঁজিবাদ বিকশিত হয়ে চলেছে। এর ফলে, আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মতবাদ, বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠান ও সম্পর্কের মধ্যে গণতন্ত্র ও যুক্তিবাদ প্রায় নেই বললেই চলে। সমগ্র সামাজিক কাঠামোতে আধুনিক পুঁজিবাদী বর্বরতার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে সহাবস্থান করছে প্রাক্-পুঁজিবাদী স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র। শোষণ, ভেদাভেদ, বিচ্ছিন্নতাবাদের বিভিন্ন রূপগুলি শুধুমাত্র রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে অবস্থান করে না, নাগরিকদের নিজেদের মধ্যেও তা অত্যন্ত প্রকটরূপে বর্তমান। সংবিধান ও আইনের লম্বা-চওড়া দাবি 'খাপ' 'গোত্র' বা জাতি পঞ্চায়েতের হাতে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এক গোত্র বা ভিন্ন জাতি বা ধর্মের মানুষের হত্যা প্রতিরোধ করতে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নারী নির্যাতনের বিবিধ রূপ— গৃহ-নির্যাতন থেকে শুরু করে পথে শ্লীলতাহানি পর্যন্ত— বেড়ে চলেছে। আইনের বারণ সত্ত্বেও কন্যা-ভ্রূণ হত্যা ও বাল্যবিবাহের মতো কুপ্রথাগুলি বহাল তবিয়তে বর্তমান। দলিত উৎপীড়নের দশাও তথৈবচ। অগণতান্ত্রিক শক্তির পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার ও গোঁড়ামিও ধর্মগত ফ্যাসিবাদের সামাজিক ভিত্তি রচনার কাজ করেছে। পুঁজিবাদী সমাজের নতুন খারাপ দিকগুলি ও প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজের পুরনো খারাপ দিকগুলির এই অদ্ভুত সমন্বয় একনায়কতান্ত্রিক নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্য জনগণের ব্যাপক ঐক্য গঠনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বর্বর জাতপাতভিত্তিক ও পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে, ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ব্যাপক ও জঙ্গি সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে না নামলে এই নাগরিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা অবান্তর হয়ে যাবে। শুধু রাষ্ট্রীয় একনায়কতন্ত্রকেই নয়, সামাজিক সাংস্কৃতিক একনায়কতন্ত্রকেও আক্রমণ করতে হবে। রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক সামাজিক আদর্শগত কর্তৃত্বকে গুঁড়িয়ে না দিলে জনসাধারণকে রাষ্ট্রীয় শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যুক্তিটা বোঝানো যাবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যেতে পারে যে, গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনকে কখনোই রক্ষণাত্মক ধরনের অধিকার রক্ষার আন্দোলনের স্তরে নামিয়ে আনা উচিত নয়, বরং এটিকে একটি ব্যাপক জঙ্গি সামাজিক আন্দোলন হিসাবে সংগঠিত করা দরকার। সংবিধান, আইন ব্যবস্থা ও সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রের ও অগণতান্ত্রিক চরিত্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রচার আন্দোলনে নামার পাশাপাশি আন্দোলনকারী সংগঠনগুলিকে এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার অগণতান্ত্রিক চরিত্রের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হতে হবে। এসব বিভিন্ন অগণতান্ত্রিক সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে যদি গণ-সচেতনতা জাগ্রত না করা যায়, তাহলে জনগণকে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা যাবে না।

৯) শাসকগোষ্ঠী যদি মেনে নেন যে ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র তবে তাদের প্রধান কর্তব্য দাঁড়ায় জনসাধারণকে জীবনধারণের প্রাথমিক আবশ্যিক সুবিধাগুলি প্রদান করা। এটি একটি জ্বলন্ত প্রশ্ন যে, ভারতবর্ষের মতো দেশে, যেখানে লক্ষপতি ও কোটিপতি বিশ্বের মধ্যে সব চাইতে দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে, যেখানে দশ কোটি শহুরে উচ্চ-মধ্যবিত্ত জনসংখ্যার জীবনযাপনের মান ইউরোপ বা আমেরিকার উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনযাপনের মানের চাইতে কোনও অংশে কম নয়, সেই দেশ কেন সবার শেষে পড়ে থাকে? কেন ভারতের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি অপুষ্টিতে ভোগে, ১৮ কোটি মানুষ গৃহহীন? কেন তিন-চতুর্থাংশ মানুষ প্রাথমিক স্বাস্থ্যের সুযোগটুকুও পান না? বিস্তারিত সমীক্ষা নয়, কিছু তথ্যে একবার নজর বোলালেই যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় যে নয়া উদারনৈতিক নীতিগুলি, যেগুলি সম্বন্ধে নির্বাচনী দলগুলি কম-বেশি সহমত, সেগুলি আসলে অত্যন্ত বর্বর জনবিরোধী নীতি। যখন মূল্যবৃদ্ধি, উচ্ছেদ, বেকারি, অনাহার, কৃষকের আত্মহত্যা প্রভৃতি সমস্যাগুলি মাথাচাড়া দেয়, ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করে, তখন সংস্কারের নিয়মমাফিক ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, নতুন কিছু আইন তৈরি করা হয়। কিন্তু এই সামান্য কল্যাণমূলক কাজ যথেষ্ট নয়। আইনগুলির মধ্যেও প্রচুর ফাঁকফোঁকর থেকে যায় (যেমন সরকারের 'দারিদ্র্যসীমা'কে আসলে বলা উচিত 'অনাহার সীমা')। তাছাড়া বর্তমান আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া এই সামান্য সংস্কারও কাজে লাগানো প্রায় অসম্ভব। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ বিষয়ে প্রচুর লেখালেখি করেছেন। এখানে তা সবিস্তারে আলোচনা সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, এই নয়া উদারনৈতিক নীতিগুলি জনগণকে জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলি থেকেও বঞ্চিত করছে। আর একই সঙ্গে তা মানুষের অপরিসীম দারিদ্র্যের সমুদ্রের মাঝখানে উন্নতির দ্বীপ ও ভোগবিলাসের প্রাসাদ তৈরি করে চলেছে। মানুষের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অবশিষ্ট গণতান্ত্রিক অধিকারটুকুকেও প্রতিদিন সংকুচিত করে চলেছে। পুষ্টিকর খাদ্য, স্বস্তিদায়ক বাসস্থান, সুস্বাস্থ্য, সমান শিক্ষা ও জীবিকার অধিকার হওয়া উচিত প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক সাংবিধানিক অধিকার। এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে একটি দেশব্যাপী আন্দোলন তাড়াহুড়ো করে এখনই করা যাবে না। মানুষকে তাদের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার বোঝাতে দীর্ঘ প্রচার ও শিক্ষা প্রয়োজন হবে। আজ উৎপাদিকা শক্তি ও সামাজিক সম্পদ উৎপাদনের যে অবস্থা, তাতে ভারত সরকার যে মানুষকে এই অধিকার দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, তা যুক্তি ও তথ্য দিয়ে জনগণকে বোঝানোটা দীর্ঘদিনের কাজ। ঐক্যবদ্ধ জনগণ যে সরকাররের উপর চাপ দিয়ে অনেক গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় করে নিতে পারে, সেটা লোককে বোঝাতে অনেক দিন লাগবে। কিন্তু কোনও কাজ সময়সাপেক্ষ হওয়া মানে তা অসম্ভব নয়। দীর্ঘ যাত্রাও শুরু হয় ছোট ছোট পদক্ষেপ দিয়েই। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনের ছত্রতলেই একমাত্র বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাদের প্রাথমিক গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়তে পারে। তা শুধুমাত্র প্রচার বা শিক্ষামূলক অভিযানের দ্বারা সাধিত হতে পারে না। ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, গণবন্টন ব্যবস্থার দুর্নীতি, MNREGA শ্রমিকদের মজুরি, উচ্ছেদ, বলপ্রয়োগপূর্বক স্থানান্তর, সরকারি স্কুলগুলির করুণ অবস্থা ইত্যাদির বিরুদ্ধে জনগণকে তৃণমূল স্তর থেকে সংগঠিত করতে হবে, ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে স্থানীয় আন্দোলনগুলিকে আরও বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের বিশ্বাস, দৈনন্দিন জীবনের মৌলিক বিষয়গুলি জনগণের ক্ষমতার এক নতুন রাজনীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হবে গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন। পুষ্টিকর খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে এবং পুলিশি অত্যাচার, উচ্ছেদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এবং গণ-সত্যাগ্রহ, অফিস ঘিরে রাখা ও দখল, আইন অমান্য, কর বয়কট, নির্বাচনী রাজনীতির নেতাদের বয়কটের মতো রূপ নিয়ে আন্দোলন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন গণ প্রতিষ্ঠান ও মঞ্চ তৈরি হবে, যেমন লোক পঞ্চায়েত, গণকাউন্সিল, গণ নজরদারি কমিটি। এগুলির মাধ্যমে সমবেত পদক্ষেপ ও সমবেত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে যেমন ভাষা দেওয়া যেতে পারে তেমনি এই

আন্দোলনের নেতৃত্বের উপর সাধারণের নজরদারিও বজায় রাখা যাবে এবং তা অনেক বেশি ভরসাযোগ্যও হবে। এইভাবে গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলন রূপান্তরিত হতে পারে নিচের তলা থেকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের একটি দেশব্যাপী আন্দোলনে। আসল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি কখনই সংবিধান বা আইনের বইয়ের পাতা থেকে তৈরি হয় না, সেগুলি তৈরি হয় ব্যাপক জনসাধারণের উদ্যোগ থেকে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রক্রিয়া থেকে উঠে আসে সেগুলি।

১০) গণতান্ত্রিক অধিকারের আন্দোলনকে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদী, বিশেষ করে হিন্দু মৌলবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর করে তোলার সাথে সাথে মনে রাখতে হবে যে, জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও গণউদ্যোগ ছাড়া এই শক্তিগুলির সঙ্গে ঠিকভাবে লড়াই করা যায় না। অযোধ্যা কাণ্ড ও গুজরাতের গণহত্যার বিরুদ্ধে আইনি লড়াই গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই, কিন্তু এ ধরনের আইনি লড়াইয়ের নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মোমবাতি জ্বালিয়ে বা নির্গুণ ও সুফি গানের অনুষ্ঠান করে হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে কার্যকর লড়াই লড়া যাবে না। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয় কিন্তু বিভিন্ন বিশ্লেষকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন: (ক) ভারতীয় রাজনীতিতে বহুদিন ধরে এই ধর্মীয় মৌলবাদী ধারাটি চলে আসছে, নির্বাচনে হেরে গেলেও এরা বহুদিন ধরে থেকে যাবে; (খ) গণআন্দোলনকে বিপথে চালনা করতে ও গণঐক্যকে ভাঙার উদ্দেশ্যে শাসকগোষ্ঠী চাইবে এই ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে টিকিয়ে রাখতে; (গ) উপনিবেশ-উত্তর কৃষিভিত্তিক ভারতীয় সমাজে যেখানে একটি অগণতান্ত্রিক শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী রয়েছে, সেটি ধর্মীয় মৌলবাদের বিস্তারের ক্ষেত্রে সহায়ক। বর্তমানে নয়া উদারনীতির নামে যে অর্থনৈতিক মৌলবাদকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা আসলে সেই সাম্প্রদায়িক মৌলবাদকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শক্তিশালী করে চলেছে। গণতান্ত্রিক ক্ষেত্র যে সংকুচিত হয়ে আসছে, তার থেকেও ফায়দা তুলছে এই শক্তি। যে সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি গরিবদের নিয়ে, শ্রমিকদের নিয়ে, আন্দোলন সংগঠিত করে তারা তাদের ব্যাপক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত দিতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং সেজন্য তারা তাদের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও দাঁড় করাতে পারেনি। এটা অবশ্য এখানে আলোচনার বিষয় নয়। ভারতে সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিফলতা এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ব্যর্থতা হিন্দু মৌলবাদীদের সামাজিক ভিত্তির প্রসারে সুবিধা করে দিয়েছে। আলোচনাকে গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের বিষয়ে সীমিত রেখেই বলতে পারি যে, জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সাহসী প্রচার চালাতে হবে। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, নিপীড়নমূলক শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে শ্রমিকদের সামনে যখন হিন্দুত্ববাদী নেতাদের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে তখন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আওয়াজ জোরদার হয়ে ওঠে, তেমনি তাদের মৌলবাদী রাজনীতির মুখোশ খুলে দেওয়াটাও অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। দ্বিতীয়ত, শ্রমজীবী মানুষকে প্রাথমিক গণতান্ত্রিক অধিকারের বিষয়ে সংগঠিত করার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যদি দীর্ঘ জঙ্গি সামাজিক আন্দোলন করা যায় তবেই এই সমস্যাগুলি সত্যিকারের মোকাবিলা করা যাবে। শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীসুলভ, সাংস্কৃতিক ও আইনি কর্মসূচির মাধ্যমে মুষ্টিমেয় ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী হিন্দুত্বের মতাদর্শের মোকাবিলা করতে পারবে না। সাম্প্রদায়িকদের একটা বড় সামাজিক ভিত্তি হলো গ্রাম ও শহরে ক্ষুদ্র মালিক গোষ্ঠী, অসচেতন নিম্ন মধ্যবিত্ত, কুলীন শ্রমিক, হতাশ মধ্যবিত্ত যুবগোষ্ঠী, লম্পট সর্বহারারা; এদের ব্যপাক জনগণের মধ্যে মিলিয়ে দিয়েই কেবল এই ভিত্তি ভাঙা সম্ভব হবে।

১১) আরেকটা বড় প্রশ্ন হল কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রক্ষমতা কর্তৃক বিভিন্ন প্রান্তীয় জাতীসত্তার উপর বর্বর সামরিক দমন-নিপীড়ন। সরকার ও মূল ধারার সংবাদমাধ্যমের অন্ধ রাষ্ট্রবাদী প্রচারের কারণে দেশের বেশিরভাগ শিক্ষিত মানুষের মনে-প্রাণে একথা স্পষ্ট ও গভীরভাবে গেঁথে গেছে যে, জম্মু-কাশ্মীরে ও দেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তের রাজ্যগুলিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির যথেষ্ট সক্রিয় উপস্থিতি রয়েছে। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনকালের ইতিহাসের কোনও উল্লেখ কখনও চোখে পড়ে না। ম্যাকমোহন রেখা কখন ও কীভাবে কার্যকর করা হয়েছিল, নাগা অধিবাসীদের স্বাধীনতার দাবি কতটা পুরোনো, স্বাধীন ভারতের সরকার এদের সাথে কীভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, কীভাবে ছল করে মণিপুরের ভারতভুক্তি ঘটানো হয়েছিল, অরুণাচল প্রদেশ কবে ভারতের রাজ্য হয়, গণভোট ছাড়াই কীভাবে সিকিমের ভারতভুক্তি ঘটানো হয়, মিজো আর উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন জাতিগুলির বিদ্রোহ ও অভ্যন্তরীণ বিবাদের ইতিহাস কী— ইতিহাস বা রাজনীতিবিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকে বা সংবাদপত্র বা টিভি, কোথাও এগুলি দেখা যায় না। ১৯৫৮ সাল থেকেই উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে চালু রয়েছে AFSPA-র মতো কালা আইন, যা ভারতের কালা কানুনগুলির মধ্যে সর্বাধিক কুখ্যাত। এই আইনটির কারণে উত্তর- পূর্বে নাগরিক অধিকারের অস্তিত্ব অর্থহীন হয়ে পড়েছে, কার্যত সামরিক শাসন ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গত এক দশকের সময়কালে নাগরিক অধিকার আন্দোলন ও ইরম শর্মিলার অনশনের জন্য, ঐ অঞ্চলে সেনাবাহিনীর বর্বর অত্যাচার ও সন্ত্রাসের কথা কিছুটা হলেও দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছে। না হলে আগে আর এসব কথা কজনই বা জানত? জম্মু কাশ্মীরে AFSPA আইনটি বলবৎ রয়েছে ১৯৯০ সাল থেকে। সেখানেও সেনাবাহিনীর অত্যাচারের কথা আজ আর কারোর অজানা নয়, যদিও নিতান্তই অল্পসংখ্যক মানুষ এ সম্পর্কে অবগত যে, জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তির চুক্তি অনুসারে এই ভারতভুক্তি ছিল

সাময়িক, বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার কথা ছিল গণভোটের মাধ্যমে। চুক্তি অনুযায়ী বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা ও অর্থ সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া সব বিষয়ে কাশ্মীরকে স্বশাসনের অধিকার প্রদান করা হয়েছিল এবং সংবিধানের ৩৭০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কাশ্মীরকে এক বিশেষ মর্যাদাও প্রদান করা হয়েছিল। গণভোটের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং ১৯৫৩ সালে শেখ আবদুল্লার নির্বাচিত সরকার বাতিল করা থেকে '৮০- দশক পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি, এ সবই কাশ্মীরের জনতাকে ক্রমে ক্রমে বিচ্ছিন্ন করতে সাহায্য করে, যার পরিণতিতে দেখা দেয় প্রথমদিকে ব্যাপক জনতার বিদ্রোহ ও পরবর্তীকালে সশস্ত্র সংগ্রাম। ১৯৯০ সালে, যবে থেকে AFSPA আইন কার্যকর হয়েছে তবে থেকে কাশ্মীরের অবস্থা বাস্তবে সামরিক শাসনের মতোই। আজ পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীর হাতে ৬০,০০০ বেশি লোক নিহত, আরও ৭০০০ জনের মতো নিখোঁজ। আগে কাশ্মীরের স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জড়িত সংগঠনগুলির একটা ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র ছিল, কিন্তু ভারতীয় সৈন্যেবাহিনীর নিপীড়ন ও তার প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট বিভেদ বিগত দুই দশক ধরে ধর্মীয় মৌলবাদী ও পাকিস্তান ঘেঁষা বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে এই সংগ্রামে নাক গলানোর সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। যেহেতু এই লেখাটিতে জম্মু কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্বের বাস্তব অবস্থার কথা সবিস্তারে আলোচনা করা সম্ভব নয় তাই আমরা এখানে দুটি বিষয়ের কথা তুলে ধরতে চাই। প্রথমটি হল জম্মু-কাশ্মীর আর উত্তর-পূর্ব থেকে AFSPA-র মতো বর্বর স্বেচ্ছাচারী আইন, যা সেনাবাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনীকে সাধারণ মানুষের নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে, সেগুলি তুলে নেওয়ার আশু দাবি। গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনকে এই বিষয়টি বিশেষ জোর দিয়ে প্রচার করতে হবে যাতে জম্মু-কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্বের বাস্তব অবস্থা ও সত্যের সাথে জনগণকে পরিচয় করানো যায়। দ্বিতীয় বিষয়টি দীর্ঘকালীন, এটি একটু জটিলও। কোনও গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলন এমন হতে পারে না যা ক্ষমতাসীন ও বিশেষ করে দক্ষিণপন্থী মৌলবাদীদের কট্টর জঙ্গি প্রচার ও জনতার উপর তার কুপ্রভাবের মোকাবেলা করে না, বা যা বিভিন্ন জাতির আত্মনির্ণয়ের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ায় না। যদি কোনও রাষ্ট্রক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনগণকে বলপূর্বক নিজের অধীন রেখে দেয় তাহলে যে কোনও প্রকৃত গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের উচিত তার প্রতিবাদ করা। জম্মু-কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্বের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা জনগণকে জানানো আমাদের কর্তব্য। যদি আমরা এই অঞ্চলের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে সরব হই তাহলে আমাদের হয়ত সাময়িকভাবে জঙ্গি রাষ্ট্রবাদী বিদ্বেষের শিকার হতে হবে। তবে যদি আমরা ব্যাপক জনতার মৌলিক অধিকারগুলি নিয়ে সোচ্চার হই এবং এগুলিকে নিয়মিতভাবে গণআন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করি, তাহলে জঙ্গি রাষ্ট্রবাদী ভাবনাগুলিকে দূরে সরিয়ে জনগণকে সত্যটা বোঝানো ও সত্যের সংগ্রামে সামিল করা সম্ভবপর হবে।

১২) গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের কর্মসূচির পরিধি বাড়িয়ে তার মধ্যে জনগণের সমস্ত অধিকারগুলিকে স্থান দেওয়া, আন্দোলনকে আরও ব্যাপক ও জঙ্গি করে গড়ে তোলা যে খুব কঠিন ও দীর্ঘমেয়াদী হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, তবে এর সাথে সাথে আমাদের কিছু অন্য আশু কাজ করতে হবে। আমরা আগেই বলেছি, আমাদের দেশে এমন সব ছোট বড় গণতান্ত্রিক অধিকার সংগঠন আছে যারা নানান রাষ্ট্রীয় অবদমন, নিপীড়ন, কালা কানুন ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে নিয়মিত সোচ্চার হয়। যদি কোনও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ন্যূনতম সাধারণ জায়গা থেকে এই বিক্ষিপ্ত আওয়াজগুলো একসাথে সঙ্ঘবদ্ধভাবে ওঠে তাহলে তার প্রভাব অবশ্যই আরও তীব্র হবে। আজকের এই নয়া উদারবাদের যুগে রাষ্ট্রের এই দমনমূলক চরিত্র মানুষের সামনে যথেষ্ট নগ্ন হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় গণআন্দোলন দমন, দেশদ্রোহ সংক্রান্ত আইন, AFSPA, ছত্রিশগড় বিশেষ জনসুরক্ষা আইন ও অন্যান্য কালা আইন, জমি অধিগ্রহণ ও দখল ইত্যাদি ঘটনার প্রতিবাদে সবচেয়ে জরুরি হল দেশের সমস্ত গণতান্ত্রির অধিকার সংস্থাগুলির একসাথে একসুরে প্রতিবাদ করা। এই সংস্থাগুলির মধ্যে মতাদর্শের তারতম্য থাকতে পারে, তাদের কার্যের এলাকা ও পদ্ধতি আলাদা হতে পারে, এমনকি কোনও স্থানীয় ঘটনার জন্যে স্থানীয় গণতান্ত্রিক অধিকার মঞ্চও থাকতে পারে, কিন্তু একটা ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে একটি দেশব্যাপী সংযুক্ত মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা আজকের দিনে দারুন অপরিহার্য।

আমরা ৯৯ শতাংশ

১৫ পৃষ্ঠায় পর

ধারণা থেকে সরে আসা তাই খুব জরুরি। প্রশ্ন তোলা, উত্তর খুঁজে বের করা, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, সংগ্রামের মধ্যে দেশের অভিমুখ বদলে দেওয়া, দেশটাকে মুক্তির স্পিরিটে দাঁড় করানো জরুরি। বর্তমানকে নয়, চলুন এই ভবিষ্যৎ উদ্‌যাপন করি, বর্তমানকে পাল্টানো, অভিমুখ পাল্টানোটাকে উদ্‌যাপন করি।

বাংলাদেশের জন্য যা, বিশ্বের জন্যও তাই। আমরা ৯৯ শতাংশ। এ বিশ্বটাকে চোর, গুন্ডা, খুনিরা দখল করে রাখবে, এটা আমরা হতে দিতে পারি না। ধ্বংস থেকে, যুদ্ধ থেকে, লুণ্ঠন থেকে, নিষ্ঠুরতা থেকে, অমানবিক দখলদারি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমাদের দরকার এই বিশ্বটাকে অতি দ্রুত দাবি করা, দখল করা।

* আনু মুহাম্মদ বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ ও সমাজকর্মী

প্রবন্ধ

ভারতে অধিকার আন্দোলনের দিশা

দীপংকর চক্রবর্তী

❑ এক

সর্বগ্রাসী বিশ্বায়নের এই যুগে বিরাট এক উথালপাথাল চলছে সমস্ত দেশের সমাজ ও অর্থনীতিতে। এখনও পর্যন্ত জাতি-রাষ্ট্রের কাঠামোটি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে বজায় থাকলেও, ক্রমপ্রসারমান বিশ্বায়িত বাজারের প্রেক্ষিতে তার ভূমিকায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আর সেই বাজারের উপর প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বাজারের আগ্রাসী ও একচ্ছত্র প্রভুত্ব, যে বাজারে আবার সারা দুনিয়াতেই সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ তথা বহুজাতিক পুঁজির। মানবিক অধিকারের যে ধারণাটি এতদিন নির্মিত হতো মূলত ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের ভিত্তিতে, এখন সেটিও অভাবনীয় ও অভূতপূর্ব সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছে।

বিশ্বায়নের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রবক্তাদের অভিমত অনুসারে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা বাজারকে এখন প্রভুত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে জীবন ও জগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে। কিন্তু মূল প্রশ্ন একটিই : 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন' বলতে তারা কী বুঝছেন? কোন্ অর্থনীতি? কার উন্নয়ন? তাতে কি ব্যাপক মানুষের কল্যাণ ও অধিকার রক্ষার নিশ্চিতি মিলবে? নির্মম বাস্তব হচ্ছে এটাই যে, বিশ্বায়িত বর্তমান বিশ্ব-অর্থনীতির মূল প্রবণতা হচ্ছে গরিব দেশগুলির বা গরিব মানুষদের বদলে ধনী দেশগুলি বা ধনী মানুষদের স্বার্থে অর্থনীতিকে পরিচালিত করা। বিশ্বায়ন-প্রণোদিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাপক মানুষের অর্থনৈতিক স্বার্থ (যেমন, জীবনযাত্রার সন্তোষজনক মান) কতটা রক্ষা করতে পারে তা নিয়ে বিতর্ক হতেই পারে, তবে একথা কিছুতেই অস্বীকার করা যাবে না যে, সম্প্রতিকালে জনগণের জমি, জীবিকা ও সম্পদ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য জনগণকে প্রায়শই রাষ্ট্রের চরম হিংসাত্মক দমন-নিপীড়নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হচ্ছে। অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার বাড়ছে জনগণের অন্য সব অধিকারের বিনিময়ে— এমনকি সরকার পর্যন্ত 'উন্নয়ন' ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার অজুহাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে।

এই প্রেক্ষিতে বাস্তবত প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, শুধুমাত্র বাজার বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার বা মাথাপিছু আয় কখনও মানুষের জীবনের মান বা নিরাপত্তার প্রকৃত সূচক হতে পারে না। প্রকৃত টেকসই (sustainable) উন্নয়ন অনেক বেশি সামগ্রিক একটি প্রক্রিয়া— নাগরিক সমাজে ব্যক্তির অবস্থান, তাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও তাদের বিকাশের সম্ভাব্যতার সুনির্দিষ্টকরণ এবং তা অর্জনের সম্ভাব্যতার নির্ধারক। একথাই প্রতিফলিত হয়েছে *রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচির* (United Nations Development Programme) ঘোষিত নীতিতে : "*মানবোন্নয়নের ধারণাটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচলিত ধারণা থেকে অনেক বেশি ব্যাপক... সমাজের সব বিষয়কেই— অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বাণিজ্য, কর্মসংস্থান, রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ— তা মানুষের দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করে। ফলত তা জোর দেয় মানুষের পছন্দের ক্রমপ্রসারের উপর।*" আরও স্পষ্টভাবে এই বক্তব্যই ধরা পড়েছে ১৯৮৬-তে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত *উন্নয়নের অধিকার* সম্পর্কিত ঘোষণায় : "*উন্নয়নের কেন্দ্রীয় বিষয়ই হচ্ছে মানুষ।*"

এই ধারণার ধারাবাহিকতাতেই প্রকৃত উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় অন্তর্লীন হয়ে থাকে নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক— সমস্ত ধরনের মানবাধিকারের একটি অবিভাজ্য ও পরস্পর-নির্ভরশীল সমগ্রতার মধ্যে। ভয় থেকে মুক্তি এবং অভাব থেকে মুক্তি হচ্ছে একই মুদ্রার দুই দিক। একারণেই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অন্যতম ভিত্তি অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কভেন্যান্ট-এর ভূমিকায় স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, "*প্রত্যেক মানুষের ক্ষেত্রে ভয় ও অভাব থেকে মানুষের মুক্তি অর্জনকারী মুক্ত মানুষের লক্ষ্য পূর্ণ হতে পারে একমাত্র তখনই, যখন অর্থনৈতিক, ও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং একই সঙ্গে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি উপভোগের শর্ত পূরণ হচ্ছে, মুক্ত মানুষের লক্ষ্যে উপনীত হবার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।*" আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় একদিকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এবং অন্যদিকে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে পৃথক ঘোষণাপত্র-সহ দু'টি পৃথক কভেন্যান্টে কৃত্রিম ও বিভ্রান্তিকর ভাবে আলাদা হিসেবে দেখানোর প্রবণতা ধরা পড়ে। তবুও ১৯৯৩ সালে ভিয়েনাতে মানবাধিকারের উপর বিভিন্ন দেশের সরকারের বিশ্ব সম্মেলনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছিল : "*সমস্ত মানবাধিকারই সর্বজনীন ও অবিভাজ্য, পরস্পর-নির্ভরশীল ও পরস্পর-সম্পর্কিত। বিশ্ব মানবসমাজকে অবশ্যই আন্তর্জাতিকভাবে মানবাধিকারকে বিবেচনা করতে হবে নিরপেক্ষতা ও সমতার একই ভিত্তিতে এবং সমান গুরুত্ব সহকারে।*"

❑ দুই

প্রথমেই স্পষ্টভাবে বলে নেওয়া দরকার যে, মানবাধিকারের ধারণাটি শ্রেণী-নিরপেক্ষ কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়, কোনো

দেশের সুনির্দিষ্ট সামাজিক বিকাশের স্তরের উপরেই মূলত তা নির্ভরশীল। সর্বকালে ও সর্বদেশে প্রযোজ্য সমাজ-নিরপেক্ষ অপরিবর্তনীয় 'বিশুদ্ধ' মানবাধিকার বলে কিছু থাকতে পারে না। মানবসমাজের বিকাশের অভিজ্ঞতা থেকে ধরা পড়েছে, সামাজিক উৎপাদিকা শক্তির ধারাবাহিক বিকাশের মাধ্যমে অর্জিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতিই মানবাধিকারের বিকাশ ও প্রসার ঘটায়, যা আবার মানুষের চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। মানব সভ্যতার সেই আদিম যুগেও মানবাধিকার সম্পর্কিত একটি প্রাথমিক চেতনার অস্তিত্ব ধরা পড়ে, কিন্তু যথোপযুক্ত সামাজিক ভিত্তির অনুপস্থিতিতে তার বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়নি, তা অর্জনের তো প্রশ্নই ওঠে না। শিল্পবিপ্লবের মধ্যে দিয়ে ইউরোপের পুঁজিবাদী সমাজে সামাজিক উৎপাদিকা শক্তির বিপ্লবীকরণই পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক, রাজকীয় ও ধর্মীয় কর্তৃত্বের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই ঈপ্সিত সামাজিক বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল, এবং ক্রমশ বিকশিত হয়েছিল এই ধারণা যে, ''*সমস্ত মানুষই জন্মগতভাবে স্বাধীন, মুক্ত এবং মর্যাদা ও অধিকারের বিচারে সমান।*'' জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে জন্ম নিতে শুরু করেছিল গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও চেতনা, যা আবার মানবাধিকারের ধারণাটির বাস্তবসম্মত ও স্পষ্ট করে তুলতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষিতে নানারকম উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে এখন প্রায় সর্বজনীনভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে যে, মানবাধিকারের ধারণাটি গতিশীল, সতত বিকাশমান— স্থানিক বা অপরিবর্তনীয় কিংবা সামাজিক বাস্তবতা-নিরপেক্ষ নয়। তবে প্রসঙ্গত গুরুত্ব দিয়ে এ কথাটিও বলা দরকার যে, মানবসমাজের বিভিন্ন পর্যায়েই সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সমস্ত মানুষের সমতা ও সম-মর্যাদার আকাbখার মধ্যে দিয়ে মানবাধিকারের ধারণাটির মূল মর্মবস্তু প্রতিফলিত হয়ে এলেও, চূড়ান্ত বিচারে তার বিকাশ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে মূলত শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীসংগ্রামের পটভূমিকাতেই।

দু'টি কাহিনীর সাহায্যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মানবাধিকারের ধারণাটির এই শ্রেণীগত চরিত্রটি ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমটি প্রখ্যাত শান্তিবাদী (pacifist) বৃটিশ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের জীবনের একটি সত্যি ঘটনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাসেল একদিন লন্ডনে একটা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। দর্শকদের মধ্যে কয়েকজন ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী, যুদ্ধ-উন্মাদনার মাদকে আচ্ছন্ন। তারা প্রথমে তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও পরে মারধর করতে শুরু করে। সেখানে উপস্থিত তাঁর এক ছাত্র তা দেখে ছুটে গিয়ে হাজির হয় কাছের এক থানায়। থানার অফিসার তখন টেবিলের উপর পা তুলে আরাম করছিল। ছাত্রটির কাছে ঘটনার বিবরণ শুনে সে জিজ্ঞেস করলো : ''তা ওই রাসেলটি কে?'' ছাত্রটি বললো, ''উনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক।'' ''তা তিনি কেন হঠাৎ যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তিমে দিতে গেলেন?'' অফিসার পাত্তা না দিয়ে প্রশ্ন করলো। ছাত্রটি বললো, ''উনি পৃথিবী-বিখ্যাত দার্শনিক।'' ''তাতেই বা কার কী এসে গেলো! বেশ হয়েছে, উনি মার খেয়েছেন'', পুলিশটি উত্তর দিলো। ছাত্রটি তো স্তম্ভিত, বললো, ''জানেন, উনি একজন লর্ড!'' সঙ্গে সঙ্গে অফিসারটি লাফিয়ে উঠলো, তড়াক করে টেবিল থেকে পা নামিয়ে মাথায় টুপি চড়িয়ে কোমরে বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে ''সর্বনাশ! আগে বলবেন তো!'' বলেই 'লর্ড' রাসেলকে বাঁচাতে ছুটলো।

দ্বিতীয়টি সত্তর দশকের পশ্চিমবঙ্গের পটভূমিকায় লেখা একটি বিখ্যাত বাংলা গল্প : *গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার*। শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত গ্রামের এক ধনী জোতদার গোপাল কাহার নামে এক ভূমিহীন কৃষকের জমি দখল করার উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে থানায় মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করলো। পুলিশ গিয়ে তাকে থানায় ধরে আনলো এবং 'গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক' বলে চিহ্নিত করে স্বীকারোক্তির নামে তার উপর চরম অত্যাচার চালালো। হতবুদ্ধি গোপাল বার বার পুলিশের পা ধরে জানালো যে, সে নির্দোষ, কারও কোনো ক্ষতি কোনো দিন করে নি, আর সেই গণতন্ত্রবাবুকেও সে চেনে না, কখনও চোখে পর্যন্ত দেখে নি। পুলিশ সে কথা না শুনে অত্যাচার চালিয়েই গেল, শেষ পর্যন্ত তার একটি পা-ই কেটে বাদ দিতে হলো।

দু'টি গল্পের দুই চরিত্র রাসেল আর গোপাল কাহারের ভবিতব্য কী হবে সেটা কিন্তু তাদের শ্রেণী-অবস্থানের ভিত্তিতে পূর্ব-নির্ধারিতই ছিল। এবং এটাই হচ্ছে শ্রেণীবিভক্ত বুর্জোয়া সমাজে গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রকৃত ছবি। সমাজের সমগ্র উপরিকাঠামোটা সম্পত্তি-সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল— যেখানে বিরাজ করছে বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যে মৌলিক ও অলঙঘনীয় এক বৈষম্য। এই মৌলিক সত্যটিকে বাদ দিয়ে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মানবাধিকারের ধারণাটি উপলব্ধি করাই সম্ভব নয়।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় স্বৈরতন্ত্রগুলির গণতান্ত্রিক রূপান্তরের ঐতিহাসিক গতিপথ নির্ভরশীল ছিল মানুষের স্বাধীনতার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উপর : (১) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা; (২) ইচ্ছেমতো গ্রেপ্তার থেকে স্বাধীনতা ও (৩) আটক থাকাকালীন অত্যাচার থেকে স্বাধীনতা। উদারনৈতিক গণতন্ত্রগুলির বিবর্তনে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকদের অলbঘনীয় নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে স্বাধীনতার এই উপাদানগুলির স্বীকৃতি ও আইনিকরণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্ন। প্রথমে সেটা ঘটেছিল ইউরোপে, তারপর ক্রমশ অন্যান্য উন্নত দেশে। মানবাধিকারের ধারণার বিবর্তনের এই প্রক্রিয়ায় বিশেষ

উল্লেখের দাবি রাখে ইংল্যান্ডের *ম্যাগনা কার্টা* (১২১৫), *পিটিশন অফ রাইটস্* (১৬২৭) ও *বিল অফ রাইটস্* (১৬৮৮); ফরাসি বিপ্লবের পরে ফ্রান্সে চালু হওয়া *ডিক্লারেশন অফ দ্য রাইটস্ অফ ম্যান অ্যান্ড সিটিজেন্স* (১৭৯১); এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের *বিল অফ রাইটস্* (১৭৮৭)। এই নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলিই ছিল আধুনিক মানবাধিকারের ধারণা র প্রথম প্রজন্মের উৎস। এর পরবর্তীকালে রুশ বিপ্লবের '*রুটি, জমি ও সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা*'র স্লোগানের প্রেরণায় সূচিত হয়েছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারকে প্রাথমিক গুরুত্ব দিয়ে মানবাধিকারের সবচেয়ে সুসংবদ্ধ ও মৌলিক স্বীকৃতি— যা বাস্তব রূপ পেয়েছিল ১৯৩৭-এ প্রণীত সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে। আর এ সবের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে যুক্ত হয়েছিল ঔপনিবেশিক দেশগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের পক্ষে এবং জাতিগত বা লিঙ্গগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা। তারই পরিণতিতে প্রশস্ত হয়েছিল ১৯৪৮-এর ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে বিশ্ব মানবাধিকার সনদ (*Universal Declaration of Human Rights*) গ্রহণের পথ — ভারত ছিল যার অন্যতম স্বাক্ষরদাতা।

❑ তিন

ভারতে মানবাধিকার আন্দোলনের সঠিক দিশার খোঁজ করতে গিয়ে আমরা এবার এদেশে মানবাধিকার আন্দোলনের বিকাশ কীভাবে ঘটেছে, সেটা একটু দেখে নেবো। স্বাভাবিকভাবেই এদেশে এই আন্দোলন জন্ম নিয়েছিল ঔপনিবেশিক আমলে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে। ১৯৩৬-এর আগে এই আন্দোলন কোনো সংগঠিত রূপ ছিল না, তবে এমনকি উনবিংশ শতকের প্রথম দিক থেকেই মানবাধিকার সম্পর্কিত চেতনার স্ফূরণ ধরা পড়ে। তখনই খুব সোচ্চার কণ্ঠে না হলেও মতামত প্রকাশের অধিকার, সংবাদপত্র প্রকাশের অধিকার ও আইনের চোখে সমানাধিকার প্রভৃতি দাবি এবং জাতিগত বৈষম্যের বিরোধিতা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ঘটতে থাকে ভ্রূণাকারে মানবাধিকার সম্পর্কিত চেতনার প্রকাশ। ক্রমশ বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে তৈরি হতে থাকে সংগঠিত আন্দোলনের জমি। এগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র (১৯১৮), রাওলাট অ্যাক্টের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন (১৯১৯), হিজলি জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর পুলিশের গুলি চালানোর বিরুদ্ধে কলকাতায় ঐতিহাসিক প্রতিবাদ-সভায় রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির ভাষণ— যার পরিণতিতে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, ব্যক্তিগত অধিকার সুরক্ষা প্রভৃতির দাবিতে কলকাতায় গঠিত হয়েছিল একটি নাগরিক কমিটি। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হয়েছিল বিংশ শতকের '২০ ও ৩০'-এর দশকে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সমাজের বিভিন্ন অংশের গণআন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছিল এবং সংগঠিত রূপ নিতে শুরু করেছিল। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (AITUC), সারা ভারত কৃষক সভা (AIKS), ছাত্র ফেডারেশন (SF), প্রগতি লেখক সংঘ (PWA) প্রভৃতি জন্ম নিয়েছিল এই সময়েই। বিভিন্ন উপদলের বহু-প্রত্যাশিত ঐক্যের ভিত্তিতে ক্রমশ সারা ভারতে বিশেষ জোরদার হয়ে উঠছিল শ্রমিক আন্দোলন। বস্তুত এই সব কিছুই সর্বভারতীয় স্তরে মানবাধিকার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য একটি মানবাধিকার সংগঠন গড়ে তোলার ভিত্তি ও পটভূমিকা তৈরি করে দিচ্ছিল।

অবশেষে ১৯৩৬-এর ২৪ আগস্ট বোম্বাইতে জন্ম নিয়েছিল সারা ভারত সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (ICLU)। প্রধান উদ্যোগটি ছিল জওহরলাল নেহরুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি, সরোজিনী নাইডু কার্যকরী সম্পাদক ও কে বি মেনন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। একুশজন সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী সমিতির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন জওহরলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ, শরৎচন্দ্র বসু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি। সংগঠনের অন্তর্নিহিত মূল বক্তব্যটি ধ্বনিত হয়েছিল জওহরলালের সমাপ্তিভাষণে : "*নাগরিক অধিকারের মূল কথাটিই হচ্ছে নাগরিকদের সরকারের বিরোধিতা করার অধিকার*।" একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার আন্দোলনের মর্মার্থই যে রাষ্ট্র-বিরোধী আন্দোলন— সেই উপলব্ধি শুরু থেকেই কার্যকর ছিল, এবং স্বাভাবিকভাবেই এখনও পর্যন্ত তা আমাদের দেশের নাগরিক অধিকার আন্দোলনে একটি সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যসম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব তৈরি করে রেখেছে।

১৯৪২-এর ব্যাপক গণজাগরণের আগে পর্যন্ত এই সংগঠনটি দেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। রাজনৈতিক বন্দীদের আটক ও হয়রানি/নির্যাতন, পুলিশি নৃশংসতা, সরকারি নিষিদ্ধকরণ ও নানাবিধ স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপ সম্পর্কে যথোপযুক্ত তদন্ত ও সেগুলির রিপোর্ট প্রকাশ, এবং তা নিয়ে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও সরকারের কাছে দাবি পেশ প্রভৃতি ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল সেই প্রথম থেকেই। আন্দোলনের সক্রিয়তা ও কার্যকারিতার প্রমাণ মিলেছিল ১৯৩৭-এ রাজ্যস্তরে নির্বাচিত কংগ্রেস সরকারগুলিকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক মানুষের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে যথোচিত গুরুত্ব দেবার জন্য নির্দেশ দেবার মধ্যেও। কিন্তু পাশাপাশি জাতীয়স্তরে গুরুত্বপূর্ণ একটি দুর্বলতার দিক ছিল এটাই যে, সশস্ত্র সংগ্রামের পথিক বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অধিকারের ব্যাপারে যথোপযুক্ত গুরুত্ব ও দৃষ্টি দেবার ব্যাপারে ঘাটতি ছিল। উল্লেখ্য যে, সংগঠিত অধিকার আন্দোলনের সূচনার

পঁচাত্তর বছর পরে আজও, কেন্দ্রে বা রাজ্যগুলিতে ক্ষমতাসীন, শুধু কংগ্রেস নয়, দক্ষিণ বা 'বাম' সমস্ত শাসক দলগুলিই কিন্তু সশস্ত্র পন্থায় ভারতের ব্যাপক মানুষের '*সনদ*'-বর্ণিত 'অভাব ও ক্ষুধা থেকে মুক্তি' অর্জনের লক্ষ্যে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের ন্যূনতম অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখতে চাইছে। কিন্তু তবুও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতে একটি ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে বিরাট সংখ্যক মানুষের মধ্যে অধিকারের ধারণাটি ছড়িয়ে দেবার ব্যাপারে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের অধিকার আন্দোলন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

❑ চার

কোনো দেশের ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্যায়ের অধিকার আন্দোলনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। তাছাড়া প্রথমেই এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ভারতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ে প্রচণ্ড এক জোয়ার এলেও, ভারতের স্বাধীনতা কিন্তু মূলত অর্জিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে— যার ফলে তাদের হাত থেকে ক্ষমতা এসেছিল সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে গাঁটছড়া-বাঁধা এদেশের মূলত সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে। ফলত ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের মানবিক ও নাগরিক অধিকার রক্ষিত হবার নিশ্চিতি মেলে নি, মিলবার বাস্তবত কোনো প্রত্যাশাও ছিল না। ভারতের সংবিধান রচিত হয়েছিল *বিশ্ব মানবাধিকার সনদ* গৃহীত হবার পর— যে *সনদ*-এর অন্যতম স্বাক্ষরদাতা ছিল ভারত। তাই স্বাভাবিকভাবেই *সনদ*-এ বিধৃত মানুষের জীবন, মতামত প্রকাশ, সংবাদপত্র, সংগঠন গঠন, যাতায়াত প্রভৃতির অধিকার সেই সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অধিকার-প্রদানকারী সংবিধানেই কোনো না অজুহাতে সমস্ত অধিকারই কেড়ে নেবার সংবিধান-সম্মত ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল।

যেমন, জওহরলাল নেহরু ছিলেন ঔপনিবেশিক শাসনকালে গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা ও শক্তি হিসেবে পরিচিত; স্বাধীন ভারতে কোনো 'কালা কানুন' চালু করা হবে না বলে বারংবার আশ্বাস দিতে তিনি তখন কার্পণ্য করেন নি। কিন্তু স্বাধীনতার পর এমনকি তাঁরই প্রধানমন্ত্রিত্বকালে, এবং পরবর্তীকালেও, এমন কোনো দীর্ঘ সময় খুঁজে পাওয়া যাবে না যখন পি ডি অ্যাক্ট, ডিআইআর, পিভিএ, মিসা, কফেপোসা, এসমা, টাডা, পোটা, ইউএপিএ প্রভৃতি কোনো না কোনো 'কালা কানুন' (হিন্দুদের দেবতা শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত নামের মতো!) এদেশের শাসনব্যবস্থায় চালু থাকেনি। সেগুলির সঙ্গে সঙ্গে দেশের বেশ কিছু এলাকায় দিনের পর দিন 'উপদ্রুত অঞ্চল আইন' ও 'আর্মড় ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট'-এর মতো ঔপনিবেশিক ও চরম স্বৈরতান্ত্রিক কালা কানুন চালু রেখে ভারত সরকার স্বাধীন ভারতে কালা কানুন চালু না রাখার পূর্ব-প্রতিশ্রুতিকে চরম প্রহসনে পরিণত করেছে।

তাছাড়া ভারতের সংবিধান প্রণয়নের সময় সংবিধানে কাজের অধিকার ও আশ্রয়ের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উঠলেও সেটা গৃহীত হয় নি। ফলত সাধারণ মেহনতি মানুষের চরম শোষণ ও নির্যাতনের প্রক্রিয়া অব্যাহতই থেকে গেছে এবং দিন দিন তার তীব্রতা বেড়ে চলেছে। স্বভাবতই উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্যায়ের শুরু থেকেই মানুষ কাজ বা জীবিকার দাবিতে, চাষের জমি ও আশ্রয়ের দাবিতে এবং মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধে বাড়াবার দাবিতে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কাজে লাগিয়ে লড়াই করেই চলেছে। এবং তা প্রতিহত করার জন্য রাষ্ট্র সমস্ত মৌলিক গণতান্ত্রিক ও আইনি রীতি-নীতি নির্লজ্জের মতো বিসর্জন দিয়ে এবং সংবিধানে বিধৃত সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার লbঘন করে অনুসরণ করছে দমন-নিপীড়ন ও নির্যাতনের, আটক রাখার, পুলিশি অত্যাচারের ও গুলি চালানোর পথ। কেন্দ্রে বা রাজ্যে যে-রঙের পতাকাবাহী সরকারই ক্ষমতাসীন থাকুক না কেন, এই 'ঐতিহ্য'ই চলছে প্রতিনিয়ত ধারাবাহিকভাবে।

এদেশে উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্যায়ে বৃটিশদের হাত থেকে মূলত সাম্রাজ্যবাদ-নির্ভর বুর্জোয়াশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় নাগরিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রক্রিয়া। প্রথম অধিকার সংগঠন যাত্রা শুরু করে ১৯৪৭-এ, মাদ্রাজ সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন গড়ে ওঠে পূর্বতন আইসিএলইউ-এর মাদ্রাজ শাখার নামেই। ১৯৪৯-এর জুলাই মাসে তাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় নাগরিক অধিকার সম্মেলন। সে বছরই জানুয়ারি মাসে বোম্বাইতেও নাগরিক অধিকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, ওই সব সম্মেলনেও এই আশঙ্কা ব্যক্ত হয় যে, ক্রমশ সংবিধান-লব্ধ সীমিত অধিকারের উপরেও আঘাত আসতে পারে। ১৯৪৮-এ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং তাদের সদস্য ও সমর্থকদের উপর প্রচণ্ড ও ব্যাপক নির্যাতন নেমে আসে। পশ্চিমবঙ্গেও একটি নাগরিক অধিকার কমিটি গড়ে ওঠে। শরৎচন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা, এন সি চ্যাটার্জী, ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সামনের সারির নেতা, বুদ্ধিজীবী, বৈজ্ঞানিক, আইনবিদ প্রভৃতিরা রাজনৈতিক কর্মীদের এবং সাধারণ মানুষের নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

এই প্রসঙ্গে ভারতে সেই উত্তর-ঔপনিবেশিক পর্যায়ের প্রথম পর্বের অধিকার আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সেই পর্বে বিভিন্ন সময়ে গড়ে-ওঠা গণ অধিকার আন্দোলন সংগঠিত করার ব্যাপারে মূল উদ্যোগটি প্রধানত নিতেন কমিউনিস্ট পার্টির (অবিভক্ত) কর্মী ও সমর্থকরাই। এই

প্রবণতা আবার অন্য দিক থেকে কিছু মৌলিক সমস্যারও জন্ম দিত। প্রথমত, কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণ নামলেই কেবল তাঁরা সক্রিয়তা দেখাতেন, ফলে আন্দোলনে কেবলমাত্র তখনই জোয়ার আসত, অন্য সময়ে চলত ভাটার টান। ফলত ধারাবাহিকতার অভাব শক্তিশালী ও সংগঠিত আন্দোলন গড়ে ওঠার পথে বাধা তৈরি করত। দ্বিতীয়ত, এবং বিশেষত, কমিউনিস্টদের আনুগত্য মূলত যেহেতু থাকতো তাঁদের পার্টি-কর্মসূচির প্রতি, ফলত পার্টি-নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট সীমার বাইরে আরও ব্যাপক ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে অধিকার আন্দোলনের লক্ষ্য ও কর্মসূচি প্রণয়ণ করাটা বাস্তবত অসম্ভব হয়ে পড়ত, ব্যাপক মানুষের মধ্যে আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়া যেত না।

বিংশ শতকের সত্তরের দশকে এই আন্দোলনের নতুন জোয়ারের পটভূমিকাতেই কেবল এই প্রবণতার বিপরীতে কম-বেশি স্বাধীন ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৭২-এ পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (*Association for Protection of Democratic Rights*, সংক্ষেপে APDR) গঠনের মধ্যে দিয়ে ভারতে আন্দোলনের বর্তমান এই নতুন ও উচ্চতর পর্বের সূচনা হয়। বিবর্তন ও বিকাশের প্রক্রিয়ায় সূচিত এই নতুন অধ্যায়েই কেবল অধিকার আন্দোলন ভারতে মূলত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক ভিত্তিতে ধারাবাহিক অস্তিত্বের ও সক্রিয়তার বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। ১৯৭৪-এ অন্ধ্রপ্রদেশেও স্থাপিত হয় স্বতন্ত্র সংগঠন এপিসিএলসি (*Andhra Pradesh Civil Liberty Committee*)। ক্রমশ সংগঠন গড়ে ওঠে দিল্লী, মহারাষ্ট্র, আসাম, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, তামিলনাড়ু প্রভৃতি প্রায় সমস্ত রাজ্যে। সারা ভারতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গে এপিডিআর গড়ে উঠেছিল এমন এক দুঃসহ মুহূর্তে, যখন এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর নেমে এসেছিল নৃশংসতম আক্রমণ; যখন গণহত্যা, জেলহত্যা, ভুয়া সংঘর্ষ প্রভৃতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হিংস্র রূপে আবির্ভূত হয়েছিল; এবং যখন শ্রমজীবী মানুষের গণ আন্দোলনের ওপর ধারাবাহিক নিপীড়ন চলছিল। স্বভাবতই সেই পটভূমিকায় এপিডিআর-এর প্রধান দাবিগুলি ছিল রাষ্ট্রের সমস্ত রকম অমানবিক, বেআইনি ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের তথা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অবসান; সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি; এবং মিসা প্রভৃতি সমস্ত কালা কানুনের বিলুপ্তি। বিপুল গণসমর্থন গড়ে উঠেছিল দাবিগুলির পিছনে। সমর্থন ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিল অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলিও। কিন্তু ১৯৭৫-এর ২৬ জুন কলমের এক খোঁচায়, সেটাও কার্যত বেআইনি পদ্ধতিতে, দেশে জারি হয়েছিল চরম স্বৈরতান্ত্রিক ও অগণতান্ত্রিক অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা। ভারতের সংবিধানে বিধৃত সমস্ত নাগরিক অধিকার বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। সেই সুযোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এপিডিআর-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল, গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বর্তমান নিবন্ধকার-সহ নেতৃস্থানীয় কর্মীদের— যাদের অধিকাংশকেই অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থার সমগ্র সময়কালে (জুন '৭৫ থেকে মার্চ '৭৭) বিনা বিচারে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। কুখ্যাত এই জরুরি অবস্থার সময় প্রধানত জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে ১৯৭৬ সালে গড়ে উঠেছিল একটি সর্বভারতীয় মানবাধিকার সংগঠন পিইউসিএল অ্যান্ড ডিআর (*People's Union for Civil liberties & Democratic Rights*)। ১৯৭৭-এর পার্লামেন্ট নির্বাচনে স্বৈরতান্ত্রিক সরকারকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল, এবং এ-ব্যাপারে জনমত গঠন করতে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল ওই সংগঠন। নির্বাচনের পর জরুরি অবস্থা প্রত্যাহৃত হবার পরবর্তীকালে সারা দেশ জুড়ে, এবং বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে, বিরাট এক আন্দোলনের জোয়ার তৈরি হয়েছিল সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট তাদের নির্বাচনী ইসতেহারে এই দাবিটিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ১৯৭৭-এর নির্বাচনে তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর ক্রমশ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি পেয়েছিলেন এবং এপিডিআর-এর উপর নিষিদ্ধকরণের পূর্ব-নির্দেশ প্রত্যাহৃত হয়েছিল। পরবর্তী দুই দশকে ভারতের প্রায় সমস্ত রাজ্যে অধিকার আন্দোলন সংগঠিত রূপ নিয়েছে। নতুন শতকের শুরুতে প্রায় সমস্ত রাজ্যের সংগঠনগুলির একটি সমন্বয় কমিটি (*Committee of Democratic Rights Organizations*) গড়ে ওঠে। ফলত সারা ভারতে এই মুহূর্তে গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার আন্দোলন বাস্তবত একটি ঐক্যবদ্ধ রূপ নিয়েছে এবং নিঃসন্দেহে বর্তমানে এই আন্দোলন ভারতীয় সমাজের একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে।

যদিও জরুরি অবস্থা প্রত্যাহৃত হবার পর নতুন নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পরবর্তীকালে সাময়িকভাবে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তবু মানবাধিকার কর্মীরা সঠিকভাবেই আশঙ্কা করছিলেন যে, কোনো না কোনো ভাবে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও পুলিশি নির্যাতন— গণআন্দোলন ও নাগরিক অধিকারের উপর রাষ্ট্রের আক্রমণ বজায় থাকবে। পরবর্তী চার দশকের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণ করেছে। সেই প্রেক্ষিতে এপিডিআর-সহ বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলনের সক্রিয়তা ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছে। তবে এই সময়কালেই বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নতুন একটি দৃষ্টিকোণ ক্রমশ আন্দোলনে বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। সেই দৃষ্টিকোণ অনুসারে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার নয়, তার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারগুলি নিয়েও জনমত ও আন্দোলন গড়াটা

ভারতের মতো তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে বিশেষভাবে জরুরি হয়ে পড়েছে। এই লক্ষ্যেই বিগত '৮০-র দশকে এপিডিআর প্রাথমিকভাবে *বিশ্ব মানবাধিকার সনদকেই* তাদের মূল লক্ষ্য ও কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করে। তার ফলে সাধারণ অ-রাজনৈতিক মানুষের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারগুলিও মানবাধিকার আন্দোলনের মধ্যে চলে আসে। বর্তমানে এপিডিআর, পিইউডিআর (দিল্লী) প্রভৃতি অধিকাংশ সংগঠনই আর শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও পুলিশি নির্যাতন এবং রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার লbঘনের বিরুদ্ধেই আন্দোলনকে সীমিত করে না রেখে অ-রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবং মেহনতি জনগণের জীবন ও জীবিকা, শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা প্রভৃতির পক্ষে, এবং বিশ্বায়ন ও পরিবেশগত দূষণ, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধেও জনমত ও আন্দোলনকে প্রসারিত করছে। ফলত বর্তমানে জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যেই মানবাধিকার সংগঠনগুলির কর্মতৎপরতা প্রসারিত হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে একথাও বলা দরকার যে, এতদিন পর্যন্ত মানবাধিকার আন্দোলনের প্রতি রাষ্ট্রের তথা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন সময়ে নানারকম পরিবর্তন এসেছে এবং সরকারি অফিসারদের অনুসৃত আচরণের মধ্যে দিয়ে তার প্রতিফলন মিলেছে। প্রথমদিকে তারা মানবাধিকার কর্মীদের দেখত অবজ্ঞার চোখে, তাদের ন্যূনতম গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতো না। তার পর আন্দোলনের ব্যাপকতা ও গণসমর্থন বাড়ার সাথে সাথে কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়, তাদেরকে একটু সমীহ ও ভয় করার প্রবণতা ধরা পড়ে; পাশাপাশি অবজ্ঞার মনোভাবও বজায় থাকে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়েছে, মানবাধিকার লঙঘনের ক্ষেত্রে আন্দোলনের কর্মীদের প্রতিনিয়ত সক্রিয় প্রতিবাদী ভূমিকার কারণে পুলিশ তাদেরকে মানবাধিকার রক্ষার নামে আসলে তারা অপরাধী ও সমাজ-বিরোধীদের স্বার্থরক্ষা করছে বলে কুৎসা করত। আর পশ্চিমবঙ্গের সদ্য-ক্ষমতাচ্যুত 'বাম'/'মার্কসবাদী' সরকার তো বিগত '৯০-এর দশক থেকে তাদেরকে 'মাওবাদী' বা 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করত। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বা কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা বার বার ধরা পড়েছে। কংগ্রেসের মতো 'মধ্যপন্থী' বা বিজেপি-র মতো হিন্দু সাম্প্রদায়িক দল, ডিএমকে-এআইডিএমকে-বিএসপি-র মতো আঞ্চলিক দল বা সিপিআই(এম)-এর মতো স্ব-ঘোষিত মার্কসবাদী দল, সবার পরিচালিত সরকারের ক্ষেত্রেই এ-কথা প্রযোজ্য। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মানবাধিকার, এমনকি আইনি বিধিনিষেধ লঙঘনের অজস্র ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাদের মূলত মানবাধিকার-বিরোধী অবস্থান ও কার্যকলাপের প্রমাণ মিলেই চলেছে।

আর কোনো সরকার বা রাজনৈতিক দলের প্রতি মানবাধিকার আন্দোলন বা সংগঠনের কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা উচিত— সে-ব্যাপারেও সুস্পষ্ট বিতর্কের মধ্যে দিয়ে মূলত একটি সঠিক অবস্থান গড়ে উঠেছে। ১৯৭৭-এ কংগ্রেস সরকারের পতনের পর জনতা দলের সরকার গঠিত হলে, পুলিশের গুলিতে কানপুরের স্বদেশি মিলে দু'জন শ্রমিকের এবং তদানীন্তন মধ্যপ্রদেশে (বর্তমান ছত্তিশগড়ে) ১২ জন খনিশ্রমিকের মৃত্যু হয়। যে পিইউসিএল অ্যান্ড ডিআর জরুরি অবস্থার সময়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল, তারাই তখন 'কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তনের সুবিধে হয়ে যাবে'— এই অজুহাতে সরকারের নিন্দা বা প্রতিবাদ করতে অস্বীকার করেন। এই বিতর্কের প্রেক্ষিতেই তাদের দিল্লী শাখা নেতৃত্বের বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে এবং আলাদা সংগঠন পিইউডিআর (*People's Union for Democratic Rights*) গঠন করে। এবং সারা দেশে এই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সরকার-নির্ভর বা দল-নির্ভর মানবাধিকার আন্দোলনের ধারণা মানবাধিকারের মৌলিক মতাদর্শের বিরোধী। বর্তমান শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে যে কোনো দেশের মানবাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি আবশ্যিক মৌলিক ভিত্তিভূমি হচ্ছে সরকার-বা-দল-নিরপেক্ষতা। কেননা এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে জনমত ও সাধ্যমতো লড়াই গড়ে তোলা। সরকার হচ্ছে সেই রাষ্ট্রেরই বশংবদ চালক। সে কারণেই এই আন্দোলনের দিক্‌নির্দেশ ও কর্মসূচি অবশ্যই গড়ে তোলা দরকার এমনভাবে, যাতে সরকারের বা সরকারি দলের স্বার্থ নয়, মানবাধিকারই সব সময়ে সার্বিক ও সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। তাই মানুষের অধিকার রক্ষার পক্ষে সরকারের কোনো পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানাতে যেমন দ্বিধা রাখার যুক্তি নেই, ঠিক তেমনি সরকারের কোনো ভ্রান্ত পদক্ষেপকে সমালোচনা করার বা স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতাকে নিন্দা করার এবং তার বিরুদ্ধে সাধ্যমতো জনমত ও আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নেও কোনোরকম আপসকে প্রশ্রয় দেওয়াটা হবে খুবই গুরুতর বিচ্যুতি। বস্তুত রাজনৈতিক দলগুলির ক্রমবর্ধমান অপরাধীকরণ (criminalisation) ও দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত হবার এবং এমনকি মানবাধিকার আন্দোলনের উপরও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নৃশংস আক্রমণের প্রবণতার পটভূমিকায় এপিডিআর, পিইউডিআর প্রভৃতি মানবাধিকার সংগঠনগুলি বহু রাজ্যে সন্ত্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

❑ পাঁচ

এর অর্থ কিন্তু কখনোই এই নয় যে, ভারতের মানবাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে সুস্পষ্ট ও সঠিক দিশা গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। ভারতের কোনো কোনো মানবাধিকার

সংগঠন যে ভারতের মতো তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারকে প্রাথমিক গুরুত্ব দেবার প্রয়োজনীয়তা ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করতে শুরু করেছে, সেকথা আমরা আগেই বলেছি। সেই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতেই বিগত '৯০-এর দশক থেকে ভারতের সমাজ ও অর্থনীতিকে কার্যত সর্বনাশের পথে ঠেলে দেবার বিশ্বায়ন কর্মসূচিরও বিরোধিতা এই আন্দোলনের মধ্যে গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিনা দ্বিধায় স্বীকার করতেই হবে যে, এখনো পর্যন্ত সেই সর্বনেশে প্রক্রিয়াকে সর্বাত্মক ও কার্যকরভাবে প্রতিহত করার মতো কোনো সুসংবদ্ধ ও সামগ্রিক মতাদর্শগত কর্মসূচি গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি। কিন্তু সেটা করাটা যে ভীষণ জরুরি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার জন্য প্রথমেই দরকার বিশেষত বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে ভারতের মতো তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে প্রযোজ্য মানবাধিকারের নতুন একটি সংজ্ঞা নির্মাণ করা। মনে রাখা দরকার, নতুন একটি সংজ্ঞা নির্মাণের এই প্রক্রিয়া অনেকটাই নির্ভর করবে মানবাধিকার তাত্ত্বিকদের শ্রেণী-অবস্থান ও শ্রেণী-স্বার্থের উপর। প্রদীপের নিচেই যেমন অন্ধকার লুকিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি, সচেতন বা অসচেতনভাবে, থেকে যায় সংশয় ও দ্বিধাগ্রস্ততার অবকাশও।

এযাবৎকাল ভারতের মতো তৃতীয় দুনিয়ার মানবাধিকার তাত্ত্বিকরা মূলত পাশ্চাত্যের উন্নত পুঁজিবাদী দেশের তাত্ত্বিকদের উপস্থাপিত মানবাধিকার সম্পর্কিত সংকীর্ণতর ধারণাটিই অনুসরণ করে আসছেন। সচরাচর পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকরা সাধারণভাবে মানবাধিকার বলতে প্রধানত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারকেই বুঝতেন, এবং তৃতীয় দুনিয়ার ব্যাপক মানুষের কাছে যা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক, সেই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি, এবং ফলত স্বাধীনভাবে তাদের নিজেদের ও দেশের বিকাশ ঘটাবার অধিকারও কার্যত অবহেলিতই থেকে যেত। এতে স্বভাবতই তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বজায় রাখার অনুকূল পরিবেশ অব্যাহত থাকত। *এমনকি বিশ্ব মানবাধিকার সনদে* পর্যন্ত সবিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারকেই, বিপরীতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি সামান্যই গুরুত্ব পেয়েছে। ১৯৬৬-তে প্রধানত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির চাপে রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক গৃহীত *অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কভেন্যান্টে* এই ভারসাম্যহীনতা দূর করার প্রচেষ্টা ধরা পড়লেও, বাস্তবে কিন্তু এখনও মানবাধিকারকে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সাথেই প্রায় সমার্থক করে রাখা হয়েছে। আবার অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে, পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকরা মানবাধিকারকে ব্যাখ্যা করেন ব্যক্তির একক দৃষ্টিকোণ থেকে; সমষ্টিগত বা জনগণের যৌথ স্বার্থের, কিংবা সমগ্র দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কথা তাঁরা সাধারণত ভাবতেই পারেন নি। বস্তুত তাঁরা চেয়েছেন তাঁদের দেশের বাস্তবতা-ভিত্তিক মানসিকতাকে সম্পূর্ণ পৃথক যাদের বাস্তবতা ও পটভূমিকা সেই তৃতীয় দুনিয়ার মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে। তৃতীয় দুনিয়ার ব্যাপক মানুষ এখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদ, কোনো না কোনো ধরণের সামন্ততন্ত্র ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার জোয়ালে আবদ্ধ থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। মধ্যযুগের সামন্ত শাসন ও গির্জার কর্তৃত্ব থেকে মূলত মুক্ত রেনেসাঁস-পরবর্তী উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে স্বাধীনতা ও বিকাশের জন্য ব্যক্তিমানুষের যে আকাbWা, তার সঙ্গে তাদের কোনোরকম সম্পর্কই নেই। ১৯৬৬-র পূর্ব-উল্লেখিত কভেন্যান্ট এবং উন্নত দেশগুলির প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯৬৮-তে রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক গৃহীত তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির *উন্নয়ন সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র* কিন্তু যুক্তিযুক্তভাবেই পরিণতি পেয়েছিল ১৯৮৬-র তেহরান ঘোষণাপত্রে : "*অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি সম্পূর্ণ অর্জিত হবার আগে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি কখনোই সম্পূর্ণভাবে অর্জিত হতে পারে না।*"

এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিপুলসংখ্যক মানুষের শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য একান্তভাবে দরকার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও জীবিকার অধিকার। তাদের জন্য সমস্ত মানবাধিকারের মধ্যে সবচেয়ে মৌলিক অধিকার হলো জীবনের অধিকার, এবং তার সাথে সাথে *বিশ্ব মানবাধিকার সনদে* বিধৃত 'ভয় থেকে মুক্তি ও ক্ষুধা থেকে মুক্তি'র লক্ষ্য প্রকৃত অর্থে অর্জন করতে হলে প্রাথমিকভাবে অবশ্যই দরকার সেই লক্ষ্য পূরণ করার জন্য যথোপযুক্ত শর্ত তৈরি করা এবং সেই সব কিছু পাবার ব্যাপারে নিশ্চিতিকে বাস্তবায়িত করা। এই সব মানুষের জন্য মানবাধিকারের একটি সামগ্রিক, সুসমন্বিত ও বাস্তব দিশা গড়ে তুলতে হলে একই সাথে দরকার তাদের জীবন ও স্বাধীনতা, খাদ্য ও মুক্তি। এবং সেটাও হবে ব্যক্তিমানুষকে কেন্দ্র করে নয়, বরং সমষ্টিকেন্দ্রিক, গোষ্ঠী ও দেশকেন্দ্রিক। স্পষ্টতই এই দৃষ্টিকোণ মানবাধিকার সম্পর্কিত পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকদের বক্তব্য অনুসারী মূলত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলি অর্জনের লক্ষ্য-বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণের বিপরীত, প্রায় বৈরিতামূলক। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদেশি শোষণমূলক ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের অধীনতা এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, শুধুমাত্র ব্যক্তিমানুষের নয়, বরং সমগ্র গোষ্ঠীর, সমগ্র দেশের স্বাধীনতার জন্য মরণপণ লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে, তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির অর্জিত ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা থেকেই তার প্রমাণ মিলেছে। এ থেকেই ব্যাখ্যা মেলে, কেন এই সব মানুষের স্বাধীনতা, এবং তার সাথে সাথে মৌলিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি তাদের কাছে

ব্যক্তিবিশেষের ব্যাপার নয়, বরং একটি সমষ্টিগত সামগ্রিক লক্ষ্য— যা আবার ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত সমগ্র গোষ্ঠীর মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়ের সঙ্গে, 'ক্ষুধা ও ভয় থেকে মুক্তি' র সঙ্গে। এটাই হচ্ছে প্রাথমিক ধারণা, যার উপর ভিত্তি করে আমরা তৃতীয় দুনিয়ার ব্যাপক মানুষের পক্ষে প্রাসঙ্গিক মানবাধিকারের মৌলিক চেতনার পুনর্নির্মাণ করতে পারি। এতদিন পর্যন্ত আমরা, ভারতের মতো তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির মানবাধিকার কর্মীরা, সম্ভবত অসচেতনভাবেই, মানবাধিকার বলতে পাশ্চাত্যের তাত্ত্বিকদের প্রচারিত যে ধারণাটিকে বুঝেছি ও বুঝিয়ে এসেছি, এমনকি প্রায় অনুকরণ করেছি, এই প্রাথমিক ধারণাটি সুনিশ্চিতভাবেই তার প্রায় বিপরীত, বহু যোজন দূরবর্তী।

❑ ছয়

তৃতীয় দুনিয়ার মানুষদের কাছে জীবনের অধিকারটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার, যেটা অর্জন ও সুনিশ্চিত করতেই হবে। এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করলেই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই একুশ শতকেও এই অধিকার অর্জন করার পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা হচ্ছে ঔপনিবেশিকতা বা রংবেরঙের সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্য, তাদের আধিপত্য ও শোষণ, তৃতীয় দুনিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ ও প্রভুত্ব। সেটাই আবার জাতিগত বৈষম্য, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা-সহ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বজায় রাখার পক্ষে সহায়তা করে এমন সব প্রাক্-পুঁজিবাদী রীতি-নীতি ও কুসংস্কারকে প্রশস্ত করে ও জিইয়ে রাখে। সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নির্মমভাবে পদদলিত করে, এবং তাদের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও সম্পদ, কাঁচা মাল ও উৎপন্ন দ্রব্য ছলে-বলে কৌশলে দখল করে তাদের আয়ের ন্যায্য উৎস থেকে তাদের বঞ্চিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে সংঘটিত প্রায় ১৫০টি বড়ো যুদ্ধের মধ্যে অধিকাংশই সংঘটিত হয়েছে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রণোদনায়, এবং স্বাভাবিকভাবেই তার কামানের খোরাক হয়েছে ওই সব দেশের লোকেরাই। বিগত একশো বছরে এই সব যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্তত ষাট লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এই সব দেশগুলির অধিকাংশতেই সাম্রাজ্যবাদ ও তার বশংবদদের শোষণ ও চক্রান্তে ব্যাপক মানুষের জীবনযাত্রার মান দিন দিন আরো বেশি খারাপ হয়ে চলেছে। পুঁজিবাদ ও বিশেষ করে তার সর্বোচ্চ পর্যায় সাম্রাজ্যবাদের আবির্ভাবের পর থেকে বিগত অন্তত সাড়ে চারশো বছর ধরে এই সব দেশে এই প্রক্রিয়াই চলছে প্রায় অব্যাহতভাবে। বিগত কয়েক দশক ধরে নয়া-উদারবাদী অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি-ভিত্তিক বিশ্বায়নের অর্থনীতি চালু হবার পর থেকে এই প্রক্রিয়া আরো অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে।

লুই ক্যারলের বিখ্যাত রূপক কাহিনী 'আয়নার মধ্যে দিয়ে'(*Through the Looking Glass*)-র সাথে তুলনা করে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করলে বিষয়টি আরও বোধগম্য হবে। ওই কাহিনীতে অ্যালিস রাণীর বাগানে দৌড়োচ্ছিল রাণীর সঙ্গে, হাতে হাত ধরে। রাণী এত জোরে দৌড়চ্ছিল যে, পিছিয়ে যাতে না পড়ে সেজন্য অ্যালিসকেও দৌড়তে হচ্ছিল সমান গতিতে। হাঁফিয়ে পড়ছিল সে, তবু কিন্তু রাণী চেঁচিয়েই যাচ্ছিল: 'জোরে, আরো জোরে'! অ্যালিসের সবচেয়ে অবাক লাগছিল এটা দেখে যে, যত জোরেই তারা দৌড়ক না কেন, দু'পাশের গাছপালাগুলো, তার মানে তারা দু'জনেও, কিন্তু থেকে যাচ্ছিল একই জায়গায়। সে রাণীকে তাই বলেছিল, "আমরা যতক্ষণ ধরে দৌড়চ্ছি, আমাদের দেশ হলে কবে অন্য কোনো জায়গায় পৌঁছে যেতাম!" উত্তরে রাণী বলেছিল, "তোমাদের দেশ তাহলে আস্তে চলে! এক জায়গায় থাকার জন্যই তোমাকে এত জোরে দৌড়তে হচ্ছে, তাহলে বোঝো, অন্য জায়গায় গিয়ে পৌঁছোতে হলে তোমাকে অন্তত দ্বিগুণ জোরে দৌড়তে হবে।" *ধরে নিন, রাণীর বাগানটা হচ্ছে পুঁজিবাদ। প্রতিনিয়ত পুঁজিবাদকে ছুটতে হচ্ছে বাজার আর মুনাফার খোঁজে, প্রতিনিয়ত পরিবর্তন সাধন করে চলতে হচ্ছে উৎপাদনের হাতিয়ারে, উৎপাদন পদ্ধতিতে ও প্রক্রিয়ায়— যা আবার প্রভাব ফেলছে শ্রেণীবিন্যাসে এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও কর্মকান্ডে। সম্প্রসারণ ও বিস্তৃতির এই সীমাহীন ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদ তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে এবং ব্যবস্থাটাকে টিকিয়ে রাখতে পারছে। এক কথায়, পুঁজিবাদ পুঁজিবাদেই থেকে যেতে পারছে। এই আপাত-বিরোধিতাকে, এই দ্বান্দ্বিকতাকে আমরা উপলব্ধিই করতে পারবো না, যদি না আমরা মনে রাখি এই বাস্তব সত্যটিকে যে, "বুর্জোয়াশ্রেণী টিকে থাকতেই পারবে না, যদি না তারা প্রতিনিয়ত উৎপাদনের হাতিয়াগুলোর এবং তার মধ্যে দিয়ে উৎপাদন-সম্পর্কের ও তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সমস্ত সম্পর্কগুলির বিপ্লবীকরণ না করে চলে"* (মার্কস ও এঙ্গেলস : *কমিউনিস্ট পার্টির ইসতেহার*)। একথা যখন বলা হয়েছিল সেই উনবিংশ শতাব্দীতে তা যেমন প্রযোজ্য ছিল, ঠিক একইভাবে তা প্রযোজ্য ছিল বিংশ শতাব্দী সম্পর্কে, এবং প্রযোজ্য রয়েছে আজকের একবিংশ শতাব্দী সম্পর্কেও, বিশেষত বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে।

এবার রাণীর পাশাপাশি ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অ্যালিসকে তুলনা করুন তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলির ব্যাপক মানুষের সঙ্গে। তাদের কাছে বিশ্বায়নের প্রকৃত তাৎপর্য কী, সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ক্রমবর্ধমান মুনাফার তাড়নায় সাম্রাজ্যবাদের প্রচণ্ড শোষণ ও লুণ্ঠনের ফলেই তারা প্রায় চিরস্থায়ীভাবে নিমজ্জিত রয়ে গেছে চরম বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের মধ্যে। সেই পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্যই তাদের শুধু ক্রমাগত দৌড়ে চলতে হচ্ছে

অ্যালিসের মতো— তবুও কিন্তু দিন দিন তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠছে খাদ্য ও বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি —এক কথায়, জীবনের ন্যূনতম চাহিদাগুলি পূরণ করা।

আর সাম্রাজ্যবাদের দিক থেকে দেখতে গেলে, এর চরমতম সংকটটি ঘনিয়ে এসেছিল ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে, যার পরিণতিতে বেঁধেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কিন্তু আবার পুঁজিবাদের সংকটকে, তার স্থবিরতাকে অনেকটাই আড়াল করতে সক্ষম হয়। যুদ্ধের প্রয়োজনে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান অনেক বেড়ে যায়। কিন্তু এই আপাত-তেজি স্তরটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়মে উদ্ভূত হয় নি। এর উৎস ছিল বাইরে, অর্থনীতি-বহির্ভূত কারণে। এই বাহ্যিক শক্তিগুলির সমন্বয়ই পুঁজিবাদের দীর্ঘায়িত স্থবিরতাকে আড়াল করে রেখে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী প্রায় তিন দশক ধরে, সত্তরের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত ক্রিয়াশীল থাকে। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠন, ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনের উপর থেকে যুদ্ধকালীন বিধিনিষেধের অবসান, যুদ্ধের প্রয়োজনে উদ্ভূত প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সর্বোপরি ঠান্ডা যুদ্ধের রাজনৈতিক অজুহাতে ও দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী যুদ্ধ পরিচালনার প্রয়োজনে বিপুল সমরাস্ত্র উৎপাদন প্রভৃতি এই বাহ্যশক্তিগুলির সক্রিয়তা বাস্তব কারণে সত্তরের দশকের শুরু থেকেই স্তিমিত হয়ে আসতে শুরু করে। এসময় থেকেই শিল্প-পুঁজির তেজি ভাব নিঃশেষিত হয়ে আসে, এবং পরিণতিতে জন্ম নেয় ১৯৭৩-৭৫-এর নতুনতর অর্থনৈতিক সংকট, যা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী কালের সবচেয়ে বড়ো সংকট।

এরপর থেকেই আবার শুরু হয়ে যায় অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য এক উল্টোরথের পালা। ১৯৭০-এর দশকে তেল সংকটের সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘনিয়ে এসেছিল সংকট। তারপর থেকেই একের পর চলছে সংকট, পুঁজিবাদ নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে ধারাবাহিক সংকটে, এখনও পর্যন্ত যার বিরতির কোনো লক্ষণ মিলছে না— ২০০৮ থেকে যার তীব্রতা আরো বেড়ে গেছে। এই ধারাবাহিক সংকটের তাড়নায় বিপর্যস্ত সাম্রাজ্য-বাদীরা পরিত্রাণের আশায় তৃতীয় দুনিয়ায় তাদের শোষণ ও লুণ্ঠনকে অনেক বেশি তীব্র করে তুলেছে। তাদের বিশেষ শ্যেনদৃষ্টি পড়েছে সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর —জমি, খনিজ, জল, এমনকি বায়ুর উপর। বিশ্বায়ন হচ্ছে চলমান চরম সংকট থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদের মূল কর্মসূচি বিশেষ। ভারতের শাসকশ্রেণীও ১৯৯১ থেকে এই পথে যাত্রা শুরু করেছে।

বিশ্বায়নের প্রবক্তারা একে তুলে ধরেন সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সর্বরোগহর বটিকা হিসেবে। মুক্ত বাজারের নীতিই তাদের দৃষ্টিতে সমৃদ্ধির একমাত্র পথ। সেকারণেই তারা বিশেষ করে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিকে বিশেষভাবে প্রণোদিত করেন, যাতে তারা তাদের দেশের 'দ্রুত উন্নতি'র স্বার্থে তাদের অর্থনীতি থেকে সমস্ত রকম নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয় এবং মুক্ত বাণিজ্য ও বিদেশি বিনিয়োগের সামনে সেগুলিকে পুরো উন্মুক্ত করে দেয়। বাস্তবে কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, বিভিন্ন দেশে বিশ্বায়নের পরিণতি দাঁড়িয়েছে এই যে, সর্বত্র বিনা ব্যতিক্রমে ধনী ও দরিদ্র দেশ ও ব্যক্তির মধ্যেকার আয়-সহ সব ক্ষেত্রে বৈষম্য বেড়েছে, বেড়েছে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দারিদ্র্য ও ব্যাপক হতাশা; এবং শ্রেণী, লিঙ্গ ও গোষ্ঠীভিত্তিক বিভাজনের তীব্রতা; দেশের সীমানা পেরিয়ে মুদ্রার গতায়াত বহু দেশে আর্থিক ও অর্থনৈতিক সংকট ডেকে এনেছে। দেশের মধ্যে মুষ্টিমেয় মানুষের এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থাগুলির সমৃদ্ধি বেড়েছে। ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও আদিবাসী মানুষকে আরো প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়েছে; তাদের মৌলিক মানবাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, নির্লজ্জভাবে পদদলিত করা হয়েছে। বিশ্বকে উপস্থাপিত করা হচ্ছে একটিমাত্র *বিশ্বায়িত গ্রাম* হিসেবে— যেখানে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের প্রসারের সাথে সাথে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে মানবাধিকারের অভূতপূর্ব অনুশীলন সম্ভব হবে। বাস্তবে কিন্তু এর ফলে সমগ্র পৃথিবী বৃহৎ ও প্রবলপ্রতাপান্বিত বহুজাতিক সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রিত পণ্য ও পরিষেবার এক বিশ্বায়িত বাজারে রূপান্তরিত হয়েছে, যার একমাত্র পরিচালিকা নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে মুনাফা, আরো মুনাফা, ও আরো বেশি মুনাফা। ফলত, সব মিলিয়ে, সমগ্র পৃথিবীর, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার মানুষের, সমস্ত মানবাধিকার নির্লজ্জভাবে পদদলিত হচ্ছে।

তৃতীয় দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের সরকারগুলি বিশ্বায়নের বিভিন্ন চুক্তিগুলি কার্যকর করার মধ্যে দিয়ে প্রায় বিনা ব্যতিক্রমে মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে। এই চুক্তি ও বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক নীতিগুলি অনুসরণের ফলে জীবিকার অধিকার, খাদ্যের অধিকার, চিকিৎসার অধিকার, শিক্ষার অধিকার ও বিকাশের অধিকার বিপন্ন হয়ে পড়েছে। (ক) মুনাফার তাড়নায় এই সব বহুজাতিক কোম্পানি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্ব জুড়ে যে সংস্কার ও পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া চালাচ্ছে, বিশ্ব শ্রম সংস্থা (ILO)-র হিসেব অনুসারে, তার ফলে সারা বিশ্বে যারা কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের এক-তৃতীয়াংশই বেকার বা আধা-বেকার। ভারতে সংগঠিত শিল্পে কাজ করছেন মাত্র ৮ শতাংশ মানুষ। ৯০ শতাংশই রয়ে গেছেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে, যাদের কোনো আইনি সুযোগ-সুবিধে বা নিরাপত্তা নেই, ফলত যাদের শিকার হতে হয় চরম শোষণের। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই সব শ্রমিকদের অবস্থান চলে যাচ্ছে একেবারে সমাজের নিম্নতম স্তরে, অর্থাৎ প্রায় ক্রীতদাসের মতো অবস্থায়। ফলে গরিব পরিবারের লোকেরা ক্যালরি পায় প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। (খ)

চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের নীতিগুলি প্রযুক্ত হবার ফলে গরিবরা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-র বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধা-স্বত্ব চুক্তি অনুসারে বিভিন্ন দেশ জেনেরিক নামে সস্তার ওষুধ তৈরি করতে পারছে না; চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের নীতিগুলি প্রযুক্ত হবার ফলে চিকিৎসা ব্যবস্থাতেও বাজারের নিয়ম চালু হচ্ছে; চিকিৎসা ব্যবস্থা, বিশেষত হাসপাতালগুলির ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিকরণ এবং ব্যক্তিগত মালিকানায় চলে আসার ফলে যাদের টাকা আছে তারাই শুধু চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে, চিকিৎসা পণ্যে পরিণত হচ্ছে। ফলত, সব মিলিয়ে, প্রতি বছর অন্তত দশ থেকে কুড়ি লক্ষ শিশুর মৃত্যু হচ্ছে, গরিব রোগীরা চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে— তাদের স্বাস্থ্যের অধিকার লিbঘত হচ্ছে। (গ) শিক্ষাব্যবস্থাতেও বাণিজ্যিকরণ এবং ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপক প্রসারের ফলে শিক্ষাও পণ্যে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা খাতে সরকারি বরাদ্দ প্রচণ্ড কমিয়ে দেবার ফলে অবৈতনিক শিক্ষাক্ষেত্রে মান ভীষণ নেমে যাচ্ছে, ব্যাপক মানুষের শিক্ষার অধিকারও লিbঘত হচ্ছে।

সমস্ত মানবাধিকারের এই ক্রমাগত ও ধারাবাহিক লbঘনের পরিণতিতে প্রতিটি দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের চমৎকার ছবি (*http://www.global issues.org/article/26/poverty-facts-and-stats*) মিলে যাবে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানে: (১) দুনিয়ার অর্ধেক মানুষকে বেঁচে থাকতে হয় দিনে দু' ডলারের (৯০ টাকার) কমে— ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন অবশ্য মনে করেন, একজন ভারতীয়ের পক্ষে ৩২ টাকাই যথেষ্ট! (২) সবচেয়ে ধনী দেশেই ধনী-দরিদ্র বৈষম্য সবচেয়ে বেশি। (৩) ধনী দেশগুলিতে সবচেয়ে ধনী ২০ শতাংশ লোক ক্রমবর্ধমান রপ্তানি বাণিজ্যের ৮২ শতাংশ ও প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ৬৮ শতাংশ ভোগ করে— সবচেয়ে দরিদ্ররা ভোগ করে ১ শতাংশেরও কম। (৪) সমস্ত দেশের হিসেবে, ১৯৬০ সালে সবচেয়ে দরিদ্র ২০ শতাংশের তুলনায় সবচেয়ে ধনীদের ২০ শতাংশের আয় ছিল ৩০ গুণ বেশি, ২০০১-এ সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪ শতাংশ, আর ২০১৫-এ সেটা ১০০ গুণ হয়ে যাবে বলে অনুমিত হচ্ছে। (৫) দুনিয়ার মাত্র কয়েকশো ক্রোড়পতির মোট সম্পদ সবচেয়ে গরিব ২৫ কোটি মানুষের মোট আয়ের সমান। (৬) দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দু'শো মানুষের মোট সম্পদ ১৯৯৯-এ ছিল দশ হাজার কোটি ডলার (১ ডলার প্রায় ৪৫ টাকা), আর ৪৩টি অনুন্নত দেশের প্রায় ষাট কোটি মানুষের মোট সম্পদ ছিল দেড় হাজার কোটি ডলার। (৭) বিশ্বায়ন যতো বেশি কার্যকর হচ্ছে, ততই ধনী লোক ও ধনী দেশগুলি আরো বেশি ধনী হচ্ছে এবং গরিব মানুষ ও গরিব দেশগুলি আরো গরিব হচ্ছে। আসলে বিশ্বায়ন কী ভয়ংকরভাবে অধিকাংশ, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ার, দেশগুলির মানুষের সমূহ সর্বনাশ করছে সেটা বোঝাবার জন্য পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পরি-সংখ্যানের জন্য অপচয় করার কোনো অর্থই হয় না, মানুষ নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই সেটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছে। বরং যে কথাটা বিশেষ জোর দিয়ে বলা দরকার সেটা হচ্ছে এই যে, পুঁজিবাদ অনেক আগেই দুনিয়ার ব্যাপক মেহনতি মানুষের সর্বনাশ বয়ে এনেছে বলে প্রমাণ মিলেছিল; বিশ্বায়ন বাস্তবত সেই সর্বনেশে প্রক্রিয়াকেই আরো অনেক বেশি তীব্র ও ব্যাপক করে তুলেছে— অধিকাংশ মানুষের প্রতিটি মৌলিক অধিকারই এখন দিন দিন বিপন্ন থেকে বিপন্নতর হয়ে পড়ছে।

এই পটভূমিকাতেই ভারতের মতো তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে মানবাধিকার আন্দোলনের এখন তাই মূল দায়িত্বই হওয়া উচিত মানুষের চেতনাকে ধারাবাহিকভাবে উন্নীত করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, যাতে তারা এই সত্যটি অনুধাবন করতে এবং এই মানুষখেকো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও তার বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার চিরতরে অবসান ঘটাবার লক্ষ্যে এগিয়ে আসতে পারে।

❑ সাত

তাই বলে যে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের দাবি এযাবৎকাল এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হিসেবে স্থাপিত ছিল (এবং রাষ্ট্রসংঘের তেহরান ঘোষণা অনুসারে, আমরা আগেই দেখেছি, যেগুলি "*অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলি সম্পূর্ণ অর্জিত হবার আগে কখনোই সম্পূর্ণভাবে অর্জিত হতে পারে না*") সেগুলিকে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলিতে ছেঁটে বাদ দেবার প্রশ্ন উঠছে না, কিন্তু প্রধান গুরুত্ব দেওয়া জরুরি ও আবশ্যিক হয়ে পড়ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারগুলির উপর। ফলত প্রকৃত অর্থে মেহনতি জনগণের স্বার্থরক্ষাকারী চলমান প্রাসঙ্গিক গণআন্দোলনগুলির সাথে মানবাধিকার আন্দোলনের আরো ঘনিষ্ঠ, কার্যত পরিপূরক, সম্পর্ক গড়ে তোলাটা বিশেষভাবে দরকার, এবং অদূর ভবিষ্যতে সেটা আরো বেশি দরকার হয়ে উঠবে। বিশ্বায়নের কর্মসূচিগুলি যতো বেশি কার্যকর হচ্ছে, ততোই এই ধরনের গণস্বার্থবাহী আন্দোলনের বিস্ফোরণ ঘটছে। ভারতে সম্প্রতিকালে মধ্য ভারতের নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, উড়িষ্যার পস্কো-বিরোধী আন্দোলন, পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম আন্দোলন, উত্তরপ্রদেশের নওদা আন্দোলন প্রভৃতি এরই দৃষ্টান্ত। পশ্চিমবঙ্গের মানবাধিকার আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন এপিডিআর-এর কর্মীরা ইতিমধ্যেই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষক-উচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলন এবং লালগড়ে আদিবাসীদের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও সরকারি চরম বঞ্চনার বিরোধী আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে নতুন ধারার মানবাধিকার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছেন। তাই তাঁরা বিনা

দ্বিধায় এগুলির পক্ষে জনমত সংগ্রহ করেছেন, এগুলির সমর্থনে মিটিং ও কনভেনশন আয়োজন করেছেন, বিভিন্নভাবে আইনি সহযোগিতা করেছেন। দিল্লীর পিইউডিআর এবং আরো বহু মানবাধিকার সংগঠনও একই রকম সক্রিয়তা দেখাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এদেশে সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বায়ন-প্রণোদিত সেজ-কর্মসূচির বিরুদ্ধে সর্বত্র মানুষ দলমতনির্বিশেষে রুখে দাঁড়িয়েছেন ও দাঁড়াচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মৌলিক দাবি অর্জনের মধ্যে দিয়ে সেই প্রবণতার প্রথম ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন হয়েছে।

এই সব অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ ভারতের মানবাধিকার কর্মীদেরই আজ বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে শুরু-হওয়া গণআন্দোলনগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মানবাধিকার আন্দোলনের একান্ত প্রয়োজনীয় দিশা ও বাস্তবসম্মত কর্মসূচি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

❑ **আট**

এই পটভূমিকাতেই আমাদের সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা দরকার যে, আমাদের দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কোনো প্রকৃত মানবাধিকার সংগঠনকে শুধুমাত্র পিটিশন লেখা, স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান, মানবাধিকার লbঘনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার তদন্ত ও তার রিপোর্ট প্রকাশ, এবং প্রতীকী প্রতিবাদ জ্ঞাপনের মধ্যে নিজেদের আন্দোলনকে সীমিত রাখলে চলবে না। আমরা পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক কাঠামো ও রীতিনীতি বজায় রেখেই আন্দোলনকে সেই সীমাবদ্ধতার বাইরেও প্রসারিত করেছি। সেক্ষেত্রে আন্দোলনের নেতৃত্ব ও পরিচালনা কোনো রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে থাকলে চলবে না, বরং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠন ও ব্যক্তির যৌথ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার উপর জোর দিতে হবে। উল্লেখ করা দরকার, সারা ভারতে *সেজ*-বিরোধী অধিকাংশ আন্দোলনই কিন্তু এভাবে পরিচালিত হচ্ছে। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম আন্দোলনের ক্ষেত্রে, কিংবা অতিসম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে সদ্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মমতা সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে পরিচালিত আন্দোলনে আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গির ই অনুশীলন করেছি। ভবিষ্যতে বার বারই আমাদের এই পন্থা অনুসরণ করতে হবে।

তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, আমাদের মতো দেশে গণআন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের বা গ্রুপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলে, সেই আন্দোলন ও মানবাধিকার আন্দোলনের মধ্যে কোনো চীনের প্রাচীর থাকতে পারে না। তবে গণআন্দোলনকে কথায় নয়, প্রকৃত অর্থে গরিব মানুষদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থে পরিচালিত হতে হবে। তা না হলে দ্বৈত আনুগত্যের সমস্যা তৈরি হয়ে যাবে। তার অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হলেই কাউকে মানবাধিকার আন্দোলনে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। কিন্তু তাকে সুনিশ্চিতভাবেই অধিকার আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও পটভূমিকা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, এবং সেটা মেনে নিয়েই তাকে সেখানে কাজ করতে হবে। অন্য দিকে, আন্দোলন যদি কোনো রাজনৈতিক দলের বা গ্রুপের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে সেই বিশেষ দলের লক্ষ্য ও কর্মসূচির স্বার্থ দেখতে গিয়ে সব সময়েই মানবাধিকার আন্দোলনের লক্ষ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচ্যুতির আশঙ্কা থেকে যাবে। আমাদের অতীতে সেরকম অভিজ্ঞতার মধ্যেও যেতে হয়েছে। এই আলোচনার প্রথম দিকেই সেই দৃষ্টান্ত দিয়েছি। ১৯৪৮-পরবর্তীকালে কমিউনিস্টদের সক্রিয়তার উপর মানবাধিকার আন্দোলনের সক্রিয়তা নির্ভর করত। জরুরি অবস্থার সময় ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়া সত্ত্বেও পিইউসিএল অ্যান্ড ডিআর ১৯৭৭-৭৮-এ জনতা সরকারের আমলে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রধান গুরুত্ব দিয়ে কানপুরে ও ছত্তিশগড়ে পুলিশের গুলিচালনার এবং পশ্চিমবঙ্গে মরিচঝাঁপির অমানবিক গণনির্যাতনের তদন্ত বা প্রতিবাদ করতে অস্বীকার করেছিল। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গেও মানবাধিকার আন্দোলনের সামনের সারির কেউ কেউ আন্দোলনের চেয়ে সরকার-নির্ভরতার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিভ্রান্তিকর কার্যকলাপ চালাবার ফলে আমাদের নতুন করে আবার সেই একই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। তবে আশার কথা, এই রাজ্যের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানবাধিকার কর্মী সেই ভ্রান্ত পথকে প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। ফলত আমাদের প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে এটাই যে, জনগণের মৌলিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সাথে সাথে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের গণ আন্দোলনের সঙ্গেও সক্রিয়ভাবে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে হবেই— কিন্তু সেটা করতে হবে মানবাধিকারের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেই।

শেষ করার আগে অবশ্যই এই প্রত্যাশা করবো যে, সেই লক্ষ্য পূরণের উপযুক্ত মানবাধিকার আন্দোলনের সঠিক দিশা ও কর্মসূচি দ্রুত তৈরি করার দায়িত্ব এদেশের মানবাধিকার তাত্ত্বিক ও কর্মীরা পালন করতে অবশ্যই এগিয়ে আসবেন।

তথ্যসূত্র:

১. চন্দ্র মুজাফ্‌ফর: 'নাগরিক অধিকার আন্দোলনে নতুন চিন্তা' *অনীক*, জানুয়ারি ১৯৯৩

২. Chandra Muzaffar : *Human Rights and the New World Order*, Just World Press, Malayasia, 1993.

২. দীপংকর চক্রবর্তী: 'মানবাধিকারের রাজনীতি', *অনীক*, মানবাধিকার সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৯৬)

৪. নিরঞ্জন বসু (রতন খাসনবিশ): 'মানবাধিকারের মতাদর্শ', *অনীক*, মানবাধিকার সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি-মার্চ, ১৯৯৬)

৫. Dipankar Chakrabarti: 'Evolution of Human Rights in India' in *Human Rights in India* (ed. Amit Bhattacharya)

৬. *তাছাড়া রাষ্ট্রসংঘের নিম্নলিখিত প্রাসঙ্গিক দলিল: (1) Universal Human Rights Declaration, (2) International Covenant on Civil and Political Rights, (3) International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights*

Åî£¸ îï¢Nîí @û¨¨˜þÔû£í ï˜Ûî

পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পিপিপি

ওষুধ নিয়ে অতি-মুনাফা q রাজ্যে রাজ্যে পুলিশ রাজ

ওয়াল স্ট্রীট দখল q বাংলাদেশের ৯৯ শতাংশ

ভূ-রাজনীতি নিয়ে টানাপোড়েন

কাশ্মীরে নিখোঁজদের খোঁজ

চালংাচ ।প [redacted]

[redacted]

[illegible] [redacted]

[redacted]

।ভাকলক p ঠঙ্ক্তি কোাপ ,A [redacted]

[redacted]

[illegible]

[illegible] [redacted]

[illegible][redacted]

[illegible] [redacted]

ফোন : [illegible]

ফ্যাক্স : [illegible]

[redacted] : [illegible]

[redacted]

[illegible]	[illegible][redacted]
[illegible]	[illegible][redacted]
[illegible]	[illegible][redacted]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[redacted]
[illegible]	[illegible]
[illegible][redacted]	

[redacted]

[illegible] [redacted]

POSTAL REGN. NO. : WB / BRS / RNP-105 / 2007-09 R.N.I REGN. NO. : 12026/65

ANEEK q 48TH YEAR : 5TH ISSUE q NOVEMBER 2011 q RUPEES FIFTEEN ONLY

অনীক

ডিসেম্বর ২০১১

সম্ভাব্য সূচি

- আজকের জঙ্গলমহল : প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা
- পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা অর্ডিন্যান্স
- গদ্দাফি, লিবিয়া ও সাম্রাজ্যবাদ
- 'আধার' : কার লাভ কার ক্ষতি
- রাজনীতি তলিয়ে যায় দুর্নীতিতে

প্রকাশিত হবে ডিসেম্বর-এর মাঝামাঝি

পত্রিকা সংক্রান্ত ঘোষণা

- অনীক প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।
- সাধারণ সংখ্যার দাম ১৫ টাকা।
- গ্রাহক চাঁদার হার ১৫০ টাকা। যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা পাঠালেই গ্রাহক করে নেওয়া হয় এবং বুকপোস্টে পত্রিকা পাঠানো হয়।
- পিপলস বুক সোসাইটি-র প্রযত্নে মানি অর্ডারে/হাতে টাকা পাঠাতে পারেন। চেক হলে তা 'Aneek' নামে হবে।
- গ্রাহক চাঁদা নবীকরণের ক্ষেত্রে, চাঁদা সময়মতো পরিশোধ না করলে, চাঁদা শেষ হবার পরের সংখ্যা গ্রাহক চাঁদা (১৫০ টাকা) + ভিপি ডাক খরচ (২৫ টাকা) ধরে ভিপি-তে পাঠানো হয়।

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

অনীক : যোগাযোগের ঠিকানা

অনীক। প্রযত্নে : পিপলস্ বুক সোসাইটি। ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলকাতা - ৭০০ ০০৯ (ফোন : ০৩৩-২২১৯-৯২৫৬)

দীপংকর চক্রবর্তী (স্বত্বাধিকারী) কর্তৃক প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি, ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ, গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী